শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

১৩২৫—আষাঢ়

মূল্য দেড় টাকা।

প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়,
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীবিহারীলাল নাথ,
এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।

(৪) **লাল চিঠি**।—(দ্বিতীয় সংস্করণ) আকবরী আমলের এক ভীষণ রহস্যময় কাহিনী। "লাল-চিঠির" সাংঘাতিক ব্যাপার যে কি ভয়ানক রহস্যজড়িত, তাহা জানিতে হইলে "লাল-চিঠি" উপন্যাস পাঠ করুন। মূল্য দেড় টাকা।

(৫) **মরণের পরে**।—সাহাজাহান বাদসাহের আমলের এক অভিশপ্ত জীবনের ভীষণ কাহিনী পূর্ণ অপূর্ব্ব ঘটনাময় উপন্যাস। ছত্রে ছত্রে, পত্রে পত্রে, নূতন কৌতূহল। পাঠ আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। মূল্য সাত সিকা।

(৬) **কঙ্কণচোর**।—চন্দ্রগুপ্তের প্রথম জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী লইয়া এই উপন্যাস রচিত। চাণক্যের কূটনীতি, মহারাজ মহানন্দের উচ্ছেদ সূচনা, মহারাণী মুরলার অদ্ভুত পতিপ্রেম, বিচিত্র রহস্যময়ী তড়িতা চরিত্রের কূট রহস্য এই উপন্যাসের বৈচিত্র সাধন করিয়াছে। ভাবে, ভাষায়, কল্পনার বিচিত্র উচ্ছ্বাসে, অপূর্ব্ব ঘটনা সমাবেশে, সত্যই ইহা অতি অপূর্ব্ব উপন্যাস। মূল্য দুই টাকা।

(৭) **রূপের মূল্য**।—রাজপুতের শৌর্য্যবীর্য্য রাজপুতরমণীর রূপগৌরব ও সতীত্বের মূল্য, দেশ রক্ষার জন্য অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ, হিন্দু রমণী চরিত্রের অপূর্ব্ব মহত্ত্ব—এই উপন্যাসে পরিকল্পিত। মূল্য দেড় টাকা।

সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ সুপণ্ডিত

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিশারদ

সুহৃদ্বরেষু—

দাদা!

আপনার অপূর্ব্ব চিকিৎসা-কৌশলে, আমার সংসারে একটী বহুমূল্য জীবন রক্ষা পাইয়াছে, তজ্জন্য আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। এ কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ হইবার উপায় নাই। তবে কৃতজ্ঞতা জানাইবার উপায় আছে। তাই আপনার গৌরবান্বিত নাম—এই গ্রন্থের সহিত বিজড়িত করিয়া রাখিলাম।

—গ্রন্থকার।

সফল-স্বপ্ন

(১)

দেড় শত বৎসরের পূর্ব্বের একটী বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ কাহিনী আজ আমরা বলিব। এই গল্পের ঘটনাগুলির উদ্ভবক্ষেত্র বসোরা নগরী। এই বসোরা লইয়া এখন সমরক্ষেত্রে হুলস্থূল উপস্থিত! এখন ইহা মহাপরাক্রান্ত ব্রিটিশ জাতির দখলে। যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সেই সময়ে ইহা মহাপরাক্রান্ত খলিফের অধিকারভুক্ত ছিল।

টাইগ্রীস্ নদীর তীরে, "দার-ইস্‌লামিয়া" নামে এক সুন্দর উদ্যান। মধ্যে গগনস্পর্শী প্রাসাদ। এই প্রাসাদে বসোরার শাসনকর্ত্তা, তুর্ক সুলতানের প্রতিনিধি, সমগ্র বিভাগের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, সুলতান আমিরুল-মুলুক নওশেরজঙ্গ গ্রীষ্মকালটি অতিবাহিত করেন।

সহর হইতে এই উদ্যানপ্রাসাদ সাত ক্রোশ দূরে। পার্শ্বে খরস্রোতা টাইগ্রীস, অগণিত তরঙ্গরাশি বুকে ধরিয়া, কলকলনাদে প্রবাহিতা। স্থানটী বড়ই নির্জ্জন। একবারে নগরের কোলাহলশূন্য। প্রকৃতির শোভাসম্পদপরিপূর্ণ।

প্রাসাদের বিপরীত দিকের নদীতীর হইতে এক প্রশস্ত প্রান্তর আরম্ভ হইয়াছে। এ প্রান্তরে আর কোন বৃক্ষই নাই—কেবল খর্জ্জুর বৃক্ষের সারি। তাহার পরই বালুময় গগনস্পর্শী পাহাড়। পাহাড়ের খুব দূরে—দিগন্তবিস্তৃত মরুক্ষেত্র। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই সুন্দর। মরুভূমি হইতে একটু দূরে, এইজন্য এখানে নিদাঘের প্রাখর্য্য অনেকটা কম। আর এই কারণে দারুণ নিদাঘে, সুলতান এই স্থানটাই বেশী পছন্দ করিতেন।

এই সুলতান নওশের জঙ্গ, যিনি বসোরা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী বিশাল ভূভাগের শাসনকর্ত্তা, তখনকার তুর্ক-সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র। নওশেরজঙ্গ অতি ন্যায়পরায়ণ ও প্রজারঞ্জক শাসনকর্ত্তা। বসোরা নগরীর বাহ্যিক উন্নতি যাহা কিছু হইয়াছিল, সবই তাঁহার আমলে। এই প্রজাপ্রিয় শাসনকর্ত্তা অনেক সময়ে তাঁহার মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া, ছদ্মবেশে প্রজার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য, গভীর রাত্রে রাজধানীর নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

দরিদ্রের দুঃখমোচন, আর্ত্তকে পরিত্রাণ, বিপন্নকে সাহায্য দান, ব্যভিচারিকে দণ্ড প্রদান, অসতীর লাঞ্ছনা, রাজপুরুষদের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার, প্রভৃতি মহৎ উদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ করিয়া, নিশাকালে সুলতান সামান্য পথিকের বেশে নগরের নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেন।

বলীয়ান শরীররক্ষীগণ তাঁহার দূরে অদূরে ছদ্মবেশে থাকিত। কোন

প্রকারের অপরাধী সম্রাটের চোখের সম্মুখে পড়িলেই, তিনি তাহাকে তখনই আটক করিয়া রাজকারাগারে প্রেরণ করিতেন। তাঁহার মুখের কথাই ছিল—আইন। তাঁহার কটিদেশে আবদ্ধ সুশাণিত তরবারিই ছিল, তাঁহার রাজ্যতন্ত্র পরিচালনের প্রধান সহায়।

এজন্য তাঁহার নাম শুনিলে অপরাধীরা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত। বসোরা নগরী এত সুশাসিত ছিল, যে পথিকেরা প্রকাশ্য রাজপথে তাহাদের বহু মূল্য দ্রব্যসম্ভার লইয়া সুখে নিদ্রা যাইত। কারণ পরস্বাপহরণের দণ্ড অতি ভয়ানক ছিল। অপরাধের লঘুত্ব বা গুরুত্ব বিবেচনায় নাসাচ্ছেদ, কর্ণচ্ছেদ, বাহুচ্ছেদ পর্য্যন্ত হইত। ইহাই সেই অতীত যুগের ভয়ানক আইন। স্বাধীন তন্ত্রের বাধাশূন্য বিধি-ব্যবস্থা।

এ হেন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ, প্রজাপ্রিয় বসোরার সুলতান এবার তাঁহার গ্রীষ্মনিবাসে আসিয়া অবধি বড়ই মনকষ্টে কাটাইতেছিলেন। কেন তাহা নিম্ন লিখিত কথোপকথন হইতেই পরিস্ফুট হইবে।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। ধূসরবর্ণের জলভরা মেঘগুলি, চাঁদের উপর দিয়া যখন চলিয়া যাইতেছিল, তখন টাইগ্রীসের চন্দ্রকরোজ্জ্বল বক্ষ যেন একটু মলিনভাব ধারণ করিতেছিল। আবার সেই মেঘ সরিয়া গেলেই, টাইগ্রীস্‌বক্ষোদ্ভূত ক্ষুদ্র তরঙ্গরাজি, চন্দ্রকর পরিপ্লাবিত হইয়া বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল।

সুলতান সেই সুনীল আকাশের, বাহ্য-প্রকৃতির, সহস্র তরঙ্গচুম্বিত চন্দ্রালোকবিচ্ছুরিত, টাইগ্রীস্‌ বক্ষের বিচিত্রশোভা একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

নৈশ প্রকৃতির সে সুন্দর সৌন্দর্য্য, তাঁহার প্রাণে প্রতি দিনই একটা শান্তিময় ভাব আনিয়া দিত। কিন্তু এদানী আর তাহা যেন হইতেছিল না।

প্রায় সপ্তাহ অতীত হইতে যায়, তিনি এই "দার—ইস্‌লামিয়া" প্রাসাদে আসিয়াছেন। এই সাত দিনই তাঁহার প্রাণে শান্তি নাই।

প্রতিদিন গভীর রাত্রে, বিচিত্র সজ্জাপরিপূর্ণ আলোকোজ্জ্বল শয়নকক্ষ ছাড়িয়া, সুলতান টাইগ্রীস্ তীরবর্ত্তী এই প্রাসাদের এক বারান্দায় নির্জ্জনে বসিয়া থাকেন। কেহই তাঁহার নিকটে আসিতে সাহস করে না।

সুলতানের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী, আমিরাবানু বেগম, তাঁহার স্বামীর এই ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া, বড়ই চিন্তিতা হইলেন। কেন এবং কিসের জন্য সুলতান, যে তাহার প্রেমময় সাহচর্য্য, ইস্তাম্বুলবাসিত সুকোমল সুখশয্যা, অসংখ্য রূপসী বাঁদির কোমলকর পরিচালিত, ব্যজনীর ব্যজন, আর সম্রাটোচিত শ্রেষ্ঠ সুখ ভোগ ত্যাগ করিয়া, এই নির্জ্জন বারান্দায় একাকী বসিয়া থাকেন, মহিষী এ পর্য্যন্ত তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই।

সুলতানের নিষেধ স্বত্বেও, একদিন মধ্যরাত্রে, বেগম সেই বারান্দার কাছে আসিয়া আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, তাঁহার রাজ-রাজেশ্বর স্বামী, উর্দ্ধে দুই বাহু তুলিয়া অতি কম্পিতস্বরে বলিতেছেন, "অভিশপ্ত জীব! আর তুমি আমায় জ্বালাতন করিও না। আমায় বলিয়া দাও, তুমি কোথায় আছ! তোমার ক্রন্দনের করুণস্বর আমায় বড়ই

চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। হতভাগ্য! তুমি আমাকে রজনীর সুখস্বপ্নময় নিদ্রাসুখ হইতে বঞ্চিত করিতেছ! তোমার কি কষ্ট—কি দুঃখ, আমায় তুমি বলিয়া যাও। জানিও,—দেশাধিপতি, মুলুকে—মালিক, মহা প্রতাপান্বিত, সুলতান নওশেরজঙ্গ তোমার এই দুঃখের প্রতিকার করিতে সমর্থ।”

বেগম কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এত ধীর গতিতে তিনি সেখানে আসিয়াছিলেন, যে চিন্তামগ্ন সুলতান তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই।

সহসা তাঁহার নিকটে এক ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব দেখিয়া, সুলতান শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—“আসিয়াছ তুমি! বল বল আমায়, কি দুঃখ তোমার ?”

বেগম-সাহেবা সুলতানের সম্মুখে আসিয়া একটী কুর্ণীস করিয়া বলিলেন—“আমার দুঃখের প্রতিকার করিতে পারিবেন কি জাঁহাপনা ?”

কণ্ঠস্বরে সুলতান বুঝিলেন—তাঁহার স্নেহময়ী বেগমই তাঁহাকে এই কথা বলিতেছেন। যাহাকে তিনি খুঁজিতেছিলেন সে আসে নাই।

এই নিষিদ্ধ সময়ে বেগমের সহসা আগমন ব্যাপারে, সুলতান মনে মনে একটু বিরক্ত হইলেন। অন্য কেহ হইলে, তাঁহার এ নিষেধ অবমাননার জন্য, হয়তো কারানিক্ষিপ্ত হইত। কিন্তু তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী প্রাণাধিকা পত্নী, তুর্কসুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্রী আমিরাবানুর উপর ত এ প্রকার কোন কিছু জুলুম চলিতে পারে না।

এজন্য দেশাধিপ প্রসন্নমুখে বলিলেন—"এস! এস! প্রিয়তমে! কিন্তু আমিরা! তুমি এত রাত্রি অবধি জাগিয়া আছ কেন?"

বেগম বলিলেন—"জাঁহাপনা! যে দিন হইতে আপনি শয্যাত্যাগ করিয়াছেন, আমিও সেই দিন হইতে নিদ্রাত্যাগ করিয়াছি। গুপ্তভাবে এই কয়দিনই আপনার কার্য্যকলাপ দেখিতেছি। বিনা সংবাদে আপনার সম্মুখে আসিতে নিষেধ থাকায়, আপনার কাছে আসিতে সাহস হয় নাই। কিন্তু এরূপ বিনিদ্র অবস্থায় নিত্য রজনী অতিবাহিত করিলে, মনের সহিত আপনার দেহও অসুস্থ হইয়া পড়িবে। এই আশঙ্কায় রাজাদেশ না মানিয়া, আজ আমি এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। বাঁদীর এ গোস্তাখি মাফ্ হৌক্।"

পতিপ্রেমাধিনী স্নেহময়ী পত্নীর এই কথায়, সুলতানের মনের সেই চঞ্চল অবস্থা অনেকটা শান্তভাব ধারণ করিল। তিনি মহিষীকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"ঐ খানে, আমার পাশে একটু স্থিরভাবে বসো—আমিরা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেই—তুমি আমার এ অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ বুঝিতে পারিবে।"

সুলতানা, স্বামীর সান্নিধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন। সুলতান বলিলেন "তোমার কোন বাঁদি তোমার সঙ্গে আসে নাই ত?"

"না—"

"ভালই হইয়াছে—যে তুমি একা আসিয়াছ! একটু অপেক্ষা কর। তোমার কর্ণদ্বয়কে খুব সতর্ক রাখ—বেগম!"

"ব্যাপার কি,—কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না।"

"মোটামুটি তোমায় কথাটা বলিয়া যাই। নদীর পরপারে ঐ যে জঙ্গল বেষ্টিত ক্ষুদ্র পাহাড়টা দেখিতেছ,—প্রতি রাত্রেই দেখিয়াছি, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর একটা খুব তীব্র আলো সেই জঙ্গলের মধ্যে জ্বলিতে থাকে। খানিকক্ষণ পরে আলোটা সহসা নিভিয়া যায়। নদীটা এখানে খুব বেশী চওড়া নয়। চার পাঁচ রশি দূরে নদীর পরপারে ঐ পাহাড়। সেই আলোটা নিভিয়া যাইবার পর সব নিশুতি হয়। তারপর নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, একটা করুণ ক্রন্দনের শব্দ জাগিয়া উঠে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমার সহোদর মিশরের শাসনকর্ত্তা সমশেরজঙ্গকে কে যেন নিত্যই কঠোর অভিশাপ দেয়। ঘণ্টাখানেক পরে এই শব্দ থামিয়া যায়। তারপর আবার ঐ অবস্থা। আর আমার সহোদরের নামের সঙ্গে আর একটী নাম আমি শুনিতে পাই। সে নামটী "লতিফা!"

বেগম এই অদ্ভুত ব্যাপার শুনিয়া বড়ই বিস্মিত হইলেন। বলিলেন—"এটা হয়ত কোন জিন্ পরীর কাণ্ড! জাঁহাপনা—একটু চেষ্টা করিলে হয় ত এ ব্যাপারের রহস্য ভেদ করিতে পারেন?"

সুলতান। কি চেষ্টা বেগম!

বেগম। দিবাভাগে আপনার জনকয়েক বিশ্বস্ত শরীর রক্ষী আর উজীর সাহেবকে ওখানে পাঠাইয়া দিলেই ত এ ব্যাপারের রহস্য ভেদ হয়।

সুলতান। সে চেষ্টার কি ত্রুটি করিয়াছি। দুই তিন দিন তাহাদের

ওখানে পাঠাইয়াছিলাম। তাহারা কোন সন্ধানই আনিতে পারে নাই; এক দিন আমি নিজে উজীরকে সঙ্গে লইয়া, দিবাভাগে ঐ পাহাড়ের চারিদিকে অন্বেষণ করিয়া আসিয়াছিলাম। দেখিলাম—সেখানে অতি দুর্ভেদ্য জঙ্গল। জনপ্রাণীর সমাগম সম্ভাবনার কোন চিহ্ন সেখানে নাই। জঙ্গলের কোন অংশেই মানুষ যাতায়াতের পথ নাই—কিম্বা কোন স্থানের জঙ্গলই মনুষ্যপদ দলিত নহে।"

বেগম। তাহা হইলে দেখিতেছি, এটা বড়ই তাজ্জব ব্যাপার!

সুলতান। বরঞ্চ তার চেয়ে বেশী। যদি আমার সহোদরের নাম এই সঙ্গে জড়িত না থাকিত—তাহা হইলে আমি এতটা বিস্মিত হইতাম না। জান ত আমার অগ্রজ, কায়রোর একজন জনপ্রিয় শাসনকর্ত্তা।

বেগম। ঐ দুটী নামের সঙ্গে আর কাহারও নাম শুনিতে পান কি?

সুলতান। না—

আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। সুলতান—সুলতানার গা টিপিয়া বলিলেন—"চুপ কর আমিরা! ঐ শোন!"

সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কে যেন কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল—"খোদার বজ্র তোমার মস্তকে পতিত হউক! সমশেরজঙ্গ তোমার ঐ রাজমুকুট চূর্ণ হইয়া যাক্! তুমি কেন আমার এ সর্ব্বনাশ করিলে? তোমার সর্ব্বস্ব বজ্রাগ্নিতে দগ্ধ হোক।"

সহসা এই অভিশাপবাক্যের বিরাম হইল। কিন্তু তখনও যেন সেই

নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, স্নিগ্ধ বাতাসের মধ্য দিয়া, অন্ধকারের বক্ষভেদ করিয়া, তাহার প্রতিধ্বনি ছুটিতে লাগিল। আর সেই কথাগুলি শুনিয়া অমন সাহসী বসোরাধিপের বুক কাঁপিয়া উঠিল। কেননা সে ক্রন্দনের আক্ষেপের ও অভিশাপবাণীর মধ্যে, যেন ভৈরবী ও আলেয়ার করুণস্বর উচ্ছ্বসিত।

বাদসা বেগমকে কম্পিতস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "ব্যাপারটা কি, কিছু বুঝিলে আমিরুন্?"

বাদসাহ—আমিরুন্নিসাকে আদর করিয়া কখনও "আমিরা" কখনও বা "আমিরুন" বলিয়া ডাকিতেন।

আমিরউন্নেসা বলিলেন,—"বুঝিলাম বই কি? আর এই করুণ ক্রন্দনের যে একটা সংক্রামকতা আছে, তাহাও আজ আমাকে স্পর্শ করিল। এ রহস্যের শীঘ্রই একটা মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন।"

সুলতান। আমাকে এ রহস্যভেদের প্রকৃত পথ দেখাইয়া দাও।

আমিরুন্। দিনের বেলা ও ভাবে সন্ধান করিলে, কিছুই হইবে না।

সুলতান। তাহা হইলে কি করিতে বল?

আমিরুন্। আমি বলি—সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে ঐ জঙ্গলের কোন নিভৃতস্থানে দলবল লইয়া জাঁহাপনাকে আত্মগোপন করিতে হইবে। যতদূর বুঝিতেছি, এ ব্যাপারটা জিন-পরীর হাঙ্গাম নয়। যখন স্পষ্টই আমরা মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াছি, আর সেই কণ্ঠস্বর পুরুষের কাতর আর্ত্তনাদপূরিত, তখন এটা মানুষের ব্যাপার না হইয়া যায় না।"

সুলতান। নিশ্চয়ই তাই।

আমিরুন। হয় তো ওখানে কোন গুপ্তগহ্বর আছে, আর লোকটা তাহার মধ্যে লুকাইয়া থাকে। দিবা ভাগে সে হয়তো আদতেই বাহির হয় না। এই জন্যই আপনার গত দুদিনের চেষ্টা বিফল হইয়াছে।

সুলতান এ কথা শুনিয়া আমিরুন্নিসাকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাই ঠিক। তুমি যে আমার অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী, বিপদে পরামর্শদায়িনী, জীবন সঙ্গিনী, তাহা তোমার এই পরামর্শেই বুঝিয়াছি।"

এই সময়ে রাজকীয় ঘণ্টাঘর হইতে তিনটা বাজিয়া গেল। আমিরুন্নেসা বলিলেন—"আর ত এখানে এ ভাবে অপেক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। চলুন, জাঁহাপনা আমরা একটু নিদ্রার চেষ্টা করি গে।"

বসোরাধিপ তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর এই অনুরোধ পালনে আর কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না। তাঁহারা দুইজনে বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

নিদ্রাতেও সুলতানের নিস্তার নাই। তিনি স্বপ্নের ঘোরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ঐ—ঐ—ঐ শোন মহিষী!"

আমিরুন্নেসা তখনই স্বামীকে জাগাইয়া দিলেন। ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্বপ্নেও কি ঐ চিন্তা আপনি ভুলিতে পারিবেন না।"

সুলতান বলিলেন—"না—ব্যাপারটা আমার মগজের মধ্যে খুবই

ঝাঁকিয়া বসিয়াছে। যতক্ষণ না এই ব্যাপারের প্রকৃত রহস্যভেদ করিতে পারিতেছি, ততক্ষণ আমার মনে তিলমাত্র শান্তি হইবে না।”

প্রভাতের আর বিলম্ব নাই। উষার পবিত্রালোকে, দিগ্‌বলয় শুভ্রবর্ণ ধারণ করিতেছে। টাইগ্রীসের সলিলরাশি, শীতল প্রভাত সমীরস্পর্শে, খুবই স্নিগ্ধ হইয়া অন্তঃপুর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতেছে।

স্নিগ্ধ প্রভাত বায়ু বসোরাধিপের প্রাণে একটা শান্তি আনিয়া দিল। তিনি প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া দরবার কক্ষে আসিলেন। একজন বান্দাকে পাঠাইয়া, তখনই উজীরকে তলব করিলেন। তৎপরে সমস্ত পরামর্শই ঠিক হইয়া গেল।

(২)

গভীর জঙ্গলাবৃত, পাহাড়ের উপত্যকার মধ্যে, পরদিন অপরাহ্ণ সময়ে, তিনজন লোক অতি সন্তর্পণে পথ অতিবাহিত করিতেছিলেন।

এই তিনজন বিজন পান্থের মধ্যে—একজন পাঠকের পূর্ব্বপরিচিত। ইনিই সুলতান নওশেরজঙ্গ—বসোরার শাসনকর্ত্তা।

অপর দুই ব্যক্তি, তাঁহার শরীররক্ষী। তাঁহাদের তিনজনেরই ছদ্মবেশ। এই ছদ্মবেশ ব্যবসায়ী সার্থবাহের মত।

কিয়দ্দূর অতিকষ্টে পথ চলিয়া, তাঁহারা তিনজনেই এক ছায়াময় বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সুলতান তাঁহার প্রধান শরীর-রক্ষীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আল্‌মামুন! আমি এই বৃক্ষতলে প্রচ্ছন্নভাবে অপেক্ষা করিতেছি। তোমরা চারিদিকটা একবার ভাল করিয়া দেখিয়া এসো!"

আদেশ প্রাপ্তি মাত্রেই, পূর্ব্বোক্ত দুইজন শরীররক্ষী সেলাম করিয়া গভীর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। সুলতান সেইস্থানে নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া না থাকিয়া, আশে পাশে-অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

সহসা একটুকরা দগ্ধ বর্ত্তিকা, তাঁহার নেত্র পথবর্ত্তী হইল। সুলতান সেই বর্ত্তিকাখণ্ডটুকু কুড়াইয়া লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন।

তিনি দেখিলেন—সেই পথের আশে পাশে ক্ষীণ পদাঙ্কচিহ্ন রহিয়াছে। এই পদাঙ্কচিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে, তিনি এমন একস্থানে উপস্থিত হইলেন—যে স্থান হইতে সম্মুখে অগ্রসর হইবার আর কোন উপায়ই নাই!

অগত্যা সেইস্থানে একটা বৃক্ষ শাখা ভাঙ্গিয়া রাখিয়া,—সুলতান অনেক চেষ্টার পর, তাঁহার প্রথম আশ্রয় স্থল প্রথমোক্ত বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন—তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যে, কেহই তখনও সেখানে ফিরিয়া আসে নাই।

জঙ্গলের পথে, পথভ্রান্তি ঘটা খুবই সম্ভব। সুলতান ভাবিলেন, হয় তো আল্‌মামুন ও তাঁহার সহকারী ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

উৎকণ্ঠিত চিত্তে, সুলতান সেই বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন

সময়ে আলমামুন আসিয়া অবনত মস্তকে কুর্ণীস করিয়া বলিল—"সুলতানের জয় হউক!"

সুলতান সোৎসুকে—বলিলেন—"কোন কিছু সন্ধান পাইলে কি?

আলমামুন, অবনত মস্তকে বলিল—"না জনাব! চারিদিক খুঁজিয়া দেখিলাম। এই জঙ্গলপূর্ণ পাহাড়ে মানুষের বসবাসের অস্তিত্ব-পর্য্যন্ত নাই।"

আলমামুনের কথা শুনিয়া, সুলতান একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন—"অন্ধ তোমরা, তাই কিছুই দেখিতে পাও নাই। আমি পাইয়াছি। এই দেখ, প্রমাণ আমার হাতে!"

সুলতান—সেই বাতির টুকরাটুকু আলমামুনের হাতে দিয়া বলিলেন "এটা কি দেখ দেখি?"

আলমামুন—বিস্মিত চিত্তে বলিল—"তাই ত! এটুকু কোথায় পাইলেন জাঁহাপনা?"

সুলতান বলিলেন—"যেখান হইতে এই পাহাড়ের পাষাণস্তূপ গগন-স্পর্শ করিয়াছে, সেইখানে এই বাতিটুকু পাইয়াছি। বাতিটার সুগন্ধ দেখিয়া বুঝিতেছ না—ইহা "আগরবর্ত্তিকা।"

আলমামুন বলিল—"জনাবের অনুমান ঠিক! নিশ্চয়ই পাহাড়ের গায়ে কোন গুপ্ত প্রবেশ দ্বার আছে।"

সুলতান। সেটা থাকা খুবই সম্ভব! বেলা শেষ হইয়া আসিতেছে। এখন করা যায় কি?

আলমামুন। নিশীথকাল পর্য্যন্ত আমাদের এই নির্জ্জন জঙ্গলে থাকিতে হইবে। কিন্তু এখানে নিরাপদ আশ্রয় স্থান কই!"

সুলতান। চেষ্টা করিলে বোধ হয় আমরা একটু নিরাপদ স্থান খুঁজিয়া লইতে পারি। এস তোমরা আমার সঙ্গে।

সুলতান অগ্রসর হইলেন। তাঁহার শরীররক্ষীরা তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইল। আসিবার সময়, সুলতান দুই একস্থানে গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং যেখানে তিনি বাতিটুকু কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইতে, তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদের বিশেষ কোন কষ্ট হইল না।

যেখান হইতে পূর্ব্বোক্ত পাষাণস্তূপ উত্থিত হইয়াছে, সুলতান ও তাঁহার সঙ্গীগণ সেইস্থানে আসিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন। তাঁহারা তিনজনেই অতি সতর্কতার সহিত—পাষাণ গাত্রের নানাস্থানে, অনুকল্পিত গুপ্তদ্বারটীর অনুসন্ধান করিলেন বটে, কিন্তু কোথাও কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না।

আলমামুন—একটু বেশীদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল, সেই পাহাড়ের একদিক দিয়া চেষ্টা করিলে উপরের এক সমতলক্ষেত্রে উঠিতে পারা যায়। সে ফিরিয়া গিয়া সুলতানকে সেই কথা বলিল।

সুলতান বলিলেন—"চল আমরা ঐ পাষাণস্তূপ লঙ্ঘন করিয়া পাহাড়ের উপরেই না হয় উঠি। চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। এর পর অন্ধকারে উপরে উঠা বড়ই বিপদজনক হইবে।"

তখন তিনজনে আলমামুনের আবিষ্কৃত পথে, ধীরে ধীরে সেই পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিলেন। উপরের উপত্যকা ভূমিতে, জঙ্গল অনেকটা কম।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরিশ্রমের পর, তাঁহারা এমন একটী সমুচ্চস্থানে উপস্থিত হইলেন, যেথান হইতে নিম্ন সমতলের চারিদিক খুব ভাল করিয়া দেখা যায়। সেইস্থান হইতে বসোরাধিপ, নদীর অপর তীরবর্ত্তী প্রাসাদের সকল অংশই দেখিতে পাইতেছিলেন।

রাত্রি প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। সেটা শুক্লপক্ষের রজনী। ভূধরশিখর, জ্যোৎস্নালোকিত হইয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছে। অদূরে ক্ষীণ রজত ধারায় মত, টাইগ্রীস্ বহিয়া যাইতেছে।

তিনজনেই সেই পাষাণস্তূপের গাত্রে পৃষ্ঠ রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। জঙ্গলের নানাস্থানে ঘুরিয়া ও পর্ব্বতারোহণের পরিশ্রমে তাঁহাদের তিনজনেরই ক্লান্তি উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং স্নিগ্ধ শৈল সমীর স্পর্শে, তিনজনেই তন্দ্রাভিভূত হইলেন।

এইরূপে প্রথম প্রহর সমুত্তীর্ণ হইল। মধ্যযামে জ্যোৎস্না আরও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শ্যামতরুশিরে, পাষাণ গাত্রে, উপত্যকার মধ্যস্থ বালুরাশিতে, সেই জ্যোৎস্নাধারা যেন এক অপূর্ব্ব স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

এই সময়ে আলমামুন সহসা জাগিয়া উঠিল। সে দেখিল, দুগ্ধ ফেণনিভ সুকোমল শয্যাতে, যে সুলতানের সুখ নিদ্রার

ব্যাঘাত হয়, তিনি পাষাণ শয্যায় শুইয়া দিবা সুষুপ্তি সুখসম্ভোগ করিতেছেন।

সে তাহার সঙ্গীকে জাগাইল। তাহাকে বলিল—"তুমি নিদ্রিত সুলতানের নিকটে থাক। আমি একবার চারিদিক দেখিয়া আসি।"

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই—আলমামুন বিস্মিতনেত্রে দেখিল, সেই পাহাড়ের নিম্নাংশে উজ্জ্বল আলোক রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আলমামুন এক পাষাণস্তূপের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, একজন লোক কৃষ্ণবসনে আবৃত হইয়া ধীরগতিতে অগ্রে অগ্রে যাইতেছে—আর তাহার পশ্চাতে দুইজন সুন্দরী বাঁদি। আর বাঁদিদের হাতে জ্বলন্ত বর্ত্তিকা।

লোকটা এই ভাবে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, একস্থানে আসিয়া স্থির-ভাবে দাঁড়াইল।

আলমামুন সেই পাষাণ স্তূপের যেস্থানে দাঁড়াইয়া এই সব ব্যাপার দেখিতেছে, তাহার নিম্নের সমতল ভূমিতেই এই সব কাণ্ড ঘটিতেছিল।

আলমামুন দেখিল, আর একটা সুবৃহৎ পাষাণখণ্ড উত্তীর্ণ হইতে পারিলে—সেই লোকটার খুব সন্নিকটে যাওয়া যায়।

সমতলে অবস্থিত, এক দ্বিতল বাটীর উচ্চতা যতটা হওয়া সম্ভব, সে সেই রূপ উচ্চতার সীমাতেই সে ছিল। সেখান হইতে নীচের সমস্ত ব্যাপার অতি স্পষ্ট দেখা যায়। সব কথা খুব ভালরূপে শোনা যায়।

আলমামুন তাহার উষ্ণীষ খুলিয়া, সেই পাষাণবক্ষে রক্ষা করিল।

পাছে সেখানে পুনরায় ফিরিয়া আসিবার সময়, পথভ্রান্তি বা স্থানসম্বন্ধে কোন গোলযোগ ঘটে, এই জন্যই এরূপ সতর্কতা অবলম্বন।

সুলতান যেখানে নিদ্রাসুখ সম্ভোগ করিতেছিলেন—সে সেইখানে আসিয়া, মৃদুভাবে তাঁহার পদদ্বয়ে হাত বুলাইতে লাগিল। সুলতান তখনই জাগিয়া উঠিলেন।

সুলতান চকিত নেত্রে আলমামুনের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন "ব্যাপার কি—আলমামুন ?"

আলমামুন জোড় হস্তে বলিল—"যে ব্যাপারের রহস্য ভেদ করিবার জন্য জাঁহাপনা এইভাবে কষ্ট ভোগ করিতেছেন—তাহার প্রথম দৃশ্য আমাদের চক্ষের সম্মুখে উন্মোচিত।"

এই কথা বলিয়া সে যাহা কিছু দেখিয়াছিল—সুলতানকে এক নিশ্বাসে সবিস্তারে তাহা বলিয়া ফেলিল।

সুলতান তখনই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আলমামুনকে আদেশ করিলেন—"বিলম্ব নিষ্প্রয়োজন। এখনই অগ্রসর হও।"

আলমামুন যে পথে সুলতানের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই পথ ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত পাষাণখণ্ডের উপর উঠিল। সেই স্থান সনাক্তের চিহ্ন তাহার উষ্ণীষ।

সুলতান আলমামুনের সহিত উপর সমতলে উঠিবামাত্রই দেখিলেন, নিম্নসমতলে—একজন লোক এক ক্ষুদ্র মৃত্তিকাস্তূপের পার্শ্বে বসিয়া, এক ভৃঙ্গার হইতে কোন ক্ষুদ্র সমাধির উপর জলধারা ঢালিতেছে। তাহার

সুগন্ধে সেই স্থান সুবাসিত হইয়া উঠিল। বোধ হইল তাহা অগুরু, কস্তুরীমিশ্রিত গুলাববারি।

তাহার সঙ্গিনী বাঁদী দুইজনও পরমা রূপসী যুবতী। তাহারা পুষ্পমাল্য ও বর্ত্তিকাহস্তে সেই ক্ষুদ্র সমাধিস্তূপের পার্শ্বে তাহাদের প্রভুর আদেশ অপেক্ষায়, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সুলতান যে স্থানে ছিলেন—তথা হইতে নীচের সমতলের দূরত্ব বড় বেশী নয়। নির্ব্বাক ভাবে—লোকটা এ পর্য্যন্ত এই সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছিল।

তাহার পর সে পুষ্প মাল্য দিয়া—সেই সমাধির এক স্থান সাজাইল। নতজানু হইয়া সেই সমাধিপার্শ্বে বসিয়া বলিল—"প্রাণাধিকে! প্রিয়তমে লতিফা! দেখ আজ আমার কি দুর্দ্দশা? এই দীর্ঘকাল আমি লোকালয় ত্যাগ করিয়া এই জনমানবশূন্য নির্জ্জন প্রদেশে, তোমার ধ্যানেই জীবন কাটাইতেছি। এত অশ্রুজল তোমর ঐ সমাধির উপর ফেলিয়াছি, যে মৃত্তিকাশোষিত না হইলে তাহাতে বোধ হয়, টাইগ্রীসের মত একটা নদীর সৃষ্টি হইতে পারিত। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর আমি। বসোরার অধীশ্বর যে ঐশ্বর্য্য কখনও চক্ষে দেখেন নাই—তাহাও আমার ভাণ্ডারে আছে। কিন্তু দেখ আজ আমার দুর্দ্দশা—শোচনীয় পরিণাম!"

"আজ কে আমার এ দুর্দ্দশা করিল? কায়রোর সেই মহাপাপিষ্ঠ শাসনকর্ত্তা নিষ্ঠুর হৃদয় সুলতান সমশের জঙ্গ। খোদা! খোদা! সমশেরের মাথায় তোমার বজ্র পড়ুক। সে নরকগর্ভে নিক্ষিপ্ত হউক।

শৃগাল কুকুরে তাহার দেহ ভক্ষণ করুক। তাহার রাজ্য ভীষণ বজ্রাগ্নিতে ছার খার হইয়া যাক্। মড়কে পূর্ণ হউক।”

“বসোরা আমার জন্মভূমি! পিতৃভূমি! বাল্যের, কিশোরের, যৌবনের ক্রীড়াকানন। আমি বেহেস্তের মত শোভাময়ী বসোরানগরী ত্যাগ করিয়া, বন্যপশুর মত যে এই পাহাড়ের নিভৃত গুহায় বাস করিতেছি, কেন—তা জান? কায়রোর সর্ব্বময় কর্ত্তা সমশের জঙ্গের সহোদর নওশের জঙ্গ—এই বসোরার মালিক। সেও ত এই শয়তানের সহোদর। তাহার রাজ্যে বাস করিতে আমার বড়ই ঘৃণা বোধ হয় যে লতিফা।”

সম্মুখের দিকে দৃষ্টি করিবামাত্র সুলতান দেখিলেন—এই স্থান হইতে তাঁহার গ্রীষ্মপ্রাসাদ “দার-ইস্‌লামিয়া” বেশী দূরবর্ত্তী নহে। এ পার ওপার। মধ্যে এই খরস্রোতা টাইগ্রীস্ ব্যবধান। অপর পারে—“দার-ইস্‌লামিয়ার” শুভ্র মিনার গুলি জ্যোৎস্নাস্নাত হইয়া, বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। সুলতান নদীতীরের যে হাওয়া-বারান্দায় বসিতেন তাহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। লোকটা এতটা উচ্চৈঃস্বরে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া বিলাপ করিতেছিল, যে তাহার প্রতিধ্বনি—সেই জনমানববিহীন পর্ব্বতকন্দরে মহাশব্দে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। সেই পাষাণস্তূপের উপর হইতে সুলতান সকল কথা গুলি অতি স্পষ্ট ভাবেই শুনিতে পাইলেন। কিন্তু প্রাসাদের বারান্দা হইতে তিনি ইহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাইতেন না।

লোকটা পূর্ব্বোক্ত সমাধিপার্শ্ব ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার সঙ্গিনীদ্বয়, ফুলের মালা গুলি কবর গাত্র হইতে তুলিয়া লইল। তারপর তাহারা ধীরপদে, অবনত মস্তকে, সেই সমাধির চারিদিক প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহারা তিনজনেই কৃষ্ণ বসন মণ্ডিত।

সুলতান অতি মৃদুস্বরে বলিলেন—"আল্‌মামুন! ইহাদের পাক্‌ড়াও করিবার উপযুক্ত সময় এই। চল আমরা উপর হইতে নীচে নামিয়া যাই। তাহা না হইলে উহাদের সহিত সাক্ষাতের কোন উপায় নাই।"

তখনই তিনজনে দৃঢ়পদে, ক্ষিপ্রগতিতে, সেই পাহাড়ের উপর হইতে নিম্ন সমতলে নামিয়া আসিয়া, এক অন্ধকারময় বৃক্ষতলে আত্মগোপন করিলেন।

পূর্ব্ব পরিদৃষ্ট সেই যুবক, নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে। শোকাচ্ছন্ন, চিন্তাকাতর সে, কাজেই জানিতে পারে নাই, তিন তিন জন লোক তাহার অতি নিকটেই এক বৃক্ষতলে আত্মগোপন করিয়া লুকাইয়া আছে।

যুবক সেই বৃক্ষতলের পার্শ্বস্থ এক পাষাণ স্তূপের পার্শ্বে আসিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া, তাহার একজন সুন্দরী সঙ্গিনীকে বলিল—"জুলিয়া! আর কেন? চল আমরা গুহার ভিতরে প্রবেশ করি।"

একটু অগ্রসর হইয়া জুলিয়া সেই পাষাণগাত্রে এক ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড দ্বারা দুই তিনবার আঘাত করিবামাত্র পাষাণখণ্ড সহসা দ্বিধা বিভক্ত

হইয়া গেল। সেস্থান এতটা চওড়া, যে তাহার মধ্য দিয়া এক একজন লোক স্বচ্ছন্দে ভিতরে যাইতে পারে।

সুলতান তখনই আলমামুনের গাত্র স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন। সে ইঙ্গিতের অর্থ—"আর আত্মগোপনের প্রয়োজন নাই। চল আমরা উহাদের সম্মুখীন হই।"

সেই যুবক, যেমন সেই উন্মুক্ত পাষাণদ্বারের মধ্য দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে যাইতেছে—এমন সময়ে আলমামুন তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল—"বসোরার অধিপতি; মহাপরাক্রান্ত সুলতান নওশের জঙ্গের আদেশ! যুবক! তুমি স্থির হইয়া দাঁড়াও। প্রস্থানের চেষ্টা করিলেই তোমায় বন্দী করিব। মহাপরাক্রান্ত সুলতান স্বয়ং তোমার সম্মুখে!"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই—সুলতান নওশেরজঙ্গ আত্মপ্রকাশ করিয়া সেই যুবকের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন—"যুবক! তোমার এই অভিশাপ বাক্য উচ্চারণের কারণ কি, যতক্ষণ না তুমি আমায় প্রকাশ করিয়া বলিবে ততক্ষণ তুমি নজরবন্দী। তোমার কোন স্বাধীনতাই নাই। বসোরার অধিপতি ও তাঁহার সহোদর কায়রোর অধীশ্বরের অমঙ্গল কামনা করিয়া তুমি রাজদ্বারে অপরাধী হইয়াছ। কিন্তু ইহার ভিতরে কি রহস্যময়-কাহিনী জড়িত, তাহা আমি শুনিতে চাই।"

যদি সেখানে সহসা বজ্রপতন হইত, কিম্বা সেই পাষাণমণ্ডিত আশ্রয় স্থান, তৃণাচ্ছাদিত পর্ণকুটীরের মত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত, তাহা

হইলেও সেই যুবক ততটা বিস্মিত হইত না—যতটা সে সুলতানকে সেই স্থানে সমুপস্থিত দেখিয়া, হইয়াছিল।

সুলতান নওশের জঙ্গের সুগঠিত মূর্ত্তি, তাহার অপরিচিত নহে। যে জঙ্গল মধ্যে দিবাভাগে কেহ আসিতে সাহস করে না, সুলতান কি সাহসে রাত্রিকালে সেই ভয়াবহ স্থানে সহসা উপস্থিত হইলেন—ইহা ভাবিয়া সে বড়ই বিস্মিত হইল। বিস্ময়বশে তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

(৩)

সেই যুবক, তখনই সুলতানের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল। সে জোড়হস্তে বসোরা, অধীশ্বরের করুণাভিক্ষা করিয়া বিনীতস্বরে বলিল, "রাজ্যেশ্বর! আমি আপনার একজন সামান্য প্রজামাত্র! কিন্তু কি অবস্থায় পড়িয়া আমি যে আপনার জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে এই অভিশাপবাক্য উচ্চারণ করি, তাহার কারণ শুনিলে আপনি বিস্মিত হইবেন। আপনার হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইবে। আমিও জাঁহাপনার নিকট মার্জ্জনার অধিকারী হইব।"

সেই যুবকের সুন্দর কান্তি, বর্ষার মেঘের মত বিষাদ কালিমামণ্ডিত। তাহার মুখখানি দেখিলে বোধ হয়, কি যেন একটা মর্ম্মদাহী প্রবল দুঃখ তাহার চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

সেই যুবকের মলিন মুখ দেখিয়া বসোরাধিপতির হৃদয়ে, দয়ার

উদ্রেক হইল। তিনি অপেক্ষকৃত প্রসন্নমুখে বলিলেন—"যুবক! তোমার নাম কি?"

সেই যুবক পুনরায় আভূমি প্রণত কুর্ণীস করিয়া বলিল—"জাঁহাপনা! এ বান্দার নাম, আলি-মনসুর। এ দাসের জন্মভূমি অই টাইগ্রীসের পরপারস্থিত বসোরানগরী। আমার পিতা একজন মণি-ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার নাম বোধ হয় জনাবের অপরিচিত নহে। তিনি জহরতী-ফরমনেয়াজ বলিয়া সহরের সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন।

সুলতান বলিলেন—"তোমার পিতার সহিত আমার যথেষ্ট পরিচয় ছিল। ধরিতে গেলে, তিনি বসোরা সরকারের একজন পুরাতন মুকিম। কিন্তু তোমার আজ এ দুর্দ্দশা কেন?"

আলি। পূর্ব্বেই তো বলিয়াছি জাঁহাপনা! এ বান্দার জীবন কাহিনী অদ্ভুত ঘটনা জালে জড়িত। এক শোচনীয় ঘটনাস্রোতে পড়িয়া, বাধ্য হইয়া, আমায় এ কষ্টকর অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে। আমি এই নির্জ্জন গুহা মধ্যে প্রেতের মত বাস করিতেছি।"

সুলতান বলিলেন—"আমাকে তোমার জীবনের সমস্ত কথা বলিতে কোন আপত্তি আছে কি?"

আলি। আমি যখন জাঁহাপনার প্রজা, তখন জনাবের হুকুম হইলেই তাহা আমায় বলিতে হইবে।

সুলতান। তাহা হইলে তুমি আমার সঙ্গে আমার প্রাসাদে চল।

আলি। সেইটী মার্জ্জনা করিবেন জনাব! এ স্থান ত্যাগ করিয়া

আর আমি কোথাও যাইব না। বসোরায় মুখ দেখাইতে আমার আর একটুও ইচ্ছা নাই। সুলতান! আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার সঙ্গে এই গহ্বরের মধ্যে চলুন। সেখানে সকল কথা বলিতে আমি প্রস্তুত।"

সুলতান, তাঁহার শরীররক্ষীদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন।

আলমামুন বলিল,—"তাহা হইলে আমরাও জনাবের সঙ্গে ভিতরে যাইতে পারিব কি?"

আলি বলিল,—"স্বচ্ছন্দে সাহেব! তাহাতে আমার কোন আপত্তিই নাই।

তৎপরে আলি, যুক্তকরে সুলতানকে বলিল,—"জাঁহাপনার কাছে এ বান্দার একটী প্রার্থনা আছে। যদি অভয় দেন, এ গোলামের বেয়াদবী বলিয়া না ভাবেন, তাহা হইলে তাহা নিবেদন করিতে পারি।"

সুলতান। আমি তোমার উপর একটুও অসন্তুষ্ট হই নাই। তোমার মলিন মুখ দেখিয়া আমার বড় মমতা হইতেছে। তোমার কোন প্রার্থনাই অপূর্ণ থাকিবে না। তোমার মনের কথা কি?"

আলি। এই গহ্বর মধ্যে প্রবেশ সময়ে জাঁহাপনা ও আপনার সঙ্গী-দের একটী বিশেষ নিয়মের অধীন হইতে হইবে।

সুলতান। কি নিয়ম?

আলি। আমি আপনাদের চোখ বাঁধিয়া ভিতরে লইয়া যাইব।

সুলতান। তাহাতে আমরা স্বীকৃত। আর বিলম্ব করিও না, আমরা

বড়ই শ্রমক্লান্ত। তোমাকে ধরিবার জন্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে হইতে আমরা এ স্থানে লুকাইয়া আছি।

আলির মলিন মুখে একটু হাসি আসিল। তার পরে সে একখানি ইস্তাম্বুলবাসিত রেশমী রুমাল বাহির করিয়া বলিল—"সুলতানের পবিত্র দেহস্পর্শে আজ ধন্য হইলাম।" এই কথা বলিয়া সে বসোরাধিপের চোখ বাঁধিয়া দিল।

তাহার পর, সে তাঁহার সঙ্গীদের উষ্ণীষ খুলিয়া তদ্দ্বারা তাহাদের চক্ষু বন্ধন করিয়া বাদসাহের হাত ধরিয়া বলিল, "সম্মুখের সিঁড়িটী নামিলেই, আমরা এক সমতল স্থানে উপস্থিত হইব। তখন আর আপনার কোন কষ্ট হইবে না। সাবধানে—আমার হাত ধরিয়া চলিয়া আসুন।"

এই সিঁড়িটী বেশী প্রশস্ত নহে। আলি—সর্ব্বাগ্রগামী। পশ্চাতে সুলতান। তৎপশ্চাতে শরীর রক্ষীদ্বয়। সকলেই পরস্পরের হাত ধরিয়া সিঁড়িতে নামিতে লাগিলেন।

আলমামুন ভাবিতেছিল, লোকটার মনে কোনরূপ শয়তানী মৎলব নাই ত? তারপর সে যখন ভাবিল যে সে এক মহাপরাক্রান্ত সুলতানের শরীররক্ষী, তখন এ ভয়ের কথাটা তাহার মনে উদিত হইয়াছে ভাবিয়া সে মনে মনে বড়ই লজ্জিত হইল। কেন না, তাহারা তিন জনেই সশস্ত্র। আর আলি অস্ত্রবিহীন। এই আলমামুন এত বলিষ্ঠ, যে সে ইচ্ছা করিলে আলির মত দুই তিন জন লোককে নীচে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে পারে।

সিঁড়ি শেষ হইবার পরই, একটা ক্ষুদ্র সমতল ক্ষেত্র। আলিমনসুর যাহা বলিয়াছিল, তাহাই ঠিক।

এই সমতল ক্ষেত্র দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর সসঙ্গী সুলতান একটী ক্ষুদ্র দালানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই দালানে পৌঁছিয়া আলি সকলের চোখের বাঁধন খুলিয়া দিল। সকলেই সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেই স্থান আলোকোজ্জ্বলিত। সম্মুখেই একটী সুন্দর, সুসজ্জিত, পাষাণ নির্ম্মিত কক্ষ। এই গুহার মধ্যে যে এমন একটী সুন্দর কক্ষ থাকিতে পারে, ইহাই আশ্চর্য্য। আর সেই কক্ষসজ্জা, যে গৃহস্বামীর সুরুচির ও উন্নত অবস্থার পরিচায়ক, তাহার আর কোন সন্দেহই নাই।

আলি, মহাসমাদরে সুলতানকে সেই তয়খানার কক্ষমধ্যে লইয়া গেল। তৎপরে ধীরস্বরে নম্রভাবে বলিল—"বহুক্ষণ ধরিয়া জাঁহাপনাকে এই জঙ্গলের মধ্যে ঘুরিতে হইয়াছে। এক অপূর্ব্ব ঘটনার মধ্য দিয়া আপনাকে আজ আমি অতিথিরূপে পাইয়াছি। এই বসোরা প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ মহাপরাক্রান্ত শাসনকর্ত্তা যিনি, তাঁহার পদরেণু আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরে পড়িয়াছে, ইহাতে আমি পরম পুলকিত। কিন্তু জাঁহাপনা! আমার একটী অনুরোধ আজ আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে।"

সুলতান সহাস্যমুখে বলিলেন,—"আলি মনসুর! তোমার এ সৌজন্যময় ব্যবহারে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। বল—তোমার দ্বিতীয় অনুরোধ কি?"

আলি যোড়হস্তে বলিল,—"পার্শ্বে আর একটী কক্ষ আছে। সেখানে

গিয়া কিছু আহার করিতে হইবে। আপনার ন্যায় রাজ্যেশ্বর অতিথি, আমার এ দীন ভাগ্যে আর কখনও জুটিবে না।"

স্থলতান আলমামুনকে লক্ষ্য করিয়া সহাস্থে বলিলেন—"আলি আজ আমাদের কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িবে না। চল—আমরা তাহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া আসি।"

লোকচরিত্রাভিজ্ঞ সম্রাট, আলির সরলতায় মুগ্ধ হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিন্তু আজীবন সৈনিকবৃত্তি পুষ্ট আলমামুনের মনে একটা সন্দেহ জন্মিল, হয় তো লোকটা এই আতিথেয়তার ভাণ করিয়া আমাদের সকলকে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করিবে। দেখা যাক্ কতদূর কি হয়।"

সেই ভোজন-কক্ষটীর সজ্জা আরও স্থন্দর। পর্ব্বতের নিভৃত গুহার মধ্যে এরূপ ভাবে যে একটী ক্ষুদ্র পুরী নির্ম্মিত হইতে পারে, তাহা দেখিয়া স্থলতান বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

কক্ষতলে একখানি খুব পুরু বস্রাই গালিচা পাতা। তাহার উপর একখানি শুভ্র সাটিনের চিকণদার চাদর। সেই বহুমূল্য চাদরের উপর স্থলতানের জন্য একটী স্বর্ণখচিত মখমলের ক্ষুদ্র বিছানা, পূর্ব্ব হইতেই তথায় রক্ষিত হইয়াছে।

স্থলতানকে সেই আসনে বসিতে বলিয়া, আলি তাহার পার্শ্বে বসিলেন। আলমামুন ও প্রহরী, স্থলতানের সম্মুখে বসিল।

আলি তাহার পার্শ্বস্থ এক বাঁদিকে ইঙ্গিত করিবামাত্রই সে তখনই

ভিতরে চলিয়া গেল। কিয়ৎকাল পরে, সে আর দুই জন পরমাসুন্দরী বাঁদিকে সঙ্গে করিয়া আনিল।

এই বাঁদীদের হস্তে—রৌপ্যপাত্রে সজ্জিত, নানাবিধ পিষ্টক আর সুমিষ্ট ফল। একটী পাত্রে কেবল আঙ্গুরগুচ্ছ। আর এক জনের হাতে স্বর্ণভৃঙ্গারে রক্ষিত সুবাসিত সেরাজী, আর রত্নখচিত বহুমূল্য পান-পাত্র।

সুলতান বাঁদীদের সৌন্দর্য্য, সাজসজ্জা ও স্বর্ণখচিত পান-পাত্রগুলির ব্যবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন—আলি মনসুর একজন সম্ভ্রান্তধনী। বাঁদীরা সেইগুলি সসম্মানে সুলতানের সম্মুখে ধরিয়া দিয়া—অন্য আদেশ অপেক্ষায় দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। আর তাহাদের মধ্যে দুইজন সুলতানকে ব্যজন করিতে লাগিল।

আলমামুন, ভোজ্যব্যাপারের বিরাট ব্যবস্থা দেখিয়া মনে মনে বলিল—"সুলতানের বহুমূল্য জীবনের উপর আমার একটা অতিরিক্ত মমতার জন্য, আমি যে এই আলিকে সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাহা দেখিতেছি ভ্রমাত্মক। এ সমস্ত খাদ্য দ্রব্য যখন আমরা আসিবার পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে, তখন এ সম্বন্ধে সন্দেহ করাটা ঠিক হয় নাই। দেখিতেছি, এই আলি মনসুরের সকল কাজই অদ্ভুত।

সকলেই একত্রে আহার করিলেন। সুলতান বলিলেন "আলি! এমন সুন্দর সুরসাল সুমিষ্ট আঙ্গুর, আমি অনেক দিন খাই নাই। তোমার প্রত্যেক কার্য্যই আমার মনে একটা মহা কৌতূহলের উদ্রেক করিয়া

দিতেছে। যাহা হউক, এখন বোধ হয় তোমার জীবনের কথাগুলি আমাকে শুনাইতে কোন আপত্তি করিবে না।”

আলি বিনয়ের সহিত বলিলেন,—“আপনার মত গৌরবান্বিত দেশাধিপতির—পদার্পণেই আমি চরিতার্থ হইয়াছি। আপনার নিকট যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছি, তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব। আমার জীবনের অদ্ভুত কাহিনী, এ পর্য্যন্ত আমার বক্ষের নিভৃত কন্দরেই আবদ্ধ আছে। জগতের কাহাকেও তাহা বলি নাই। তবে আপনাকে বলিব। কেননা আপনি আদর্শ নরপতি। কিন্তু এ সব কথা আমি আপনাকে অতি নির্জ্জনে বলিতে চাই। আপনার সঙ্গীদের অন্য কক্ষে যাইতে বলুন। তাঁহাদের বিশ্রাম ব্যবস্থার জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ স্থির করিয়া দিয়াছি। আমি ও আপনি আর একটী স্বতন্ত্র কক্ষে গিয়া কথা আরম্ভ করিব।”

(৪)

(আলি মনসুরের কাহিনী)

আলি, এক সুখাসনে সুলতানকে বসাইয়া, নিজে তাঁহার পার্শ্বস্থ একটী আসন অধিকার করিয়া বলিল—“জানিনা আজ সারারাত্রি বলিলেও আমার এ শোচনীয় জীবন কাহিনী শেষ হইবে কি না? বোধ হয় সমস্ত রাত্রি সটান জাগিয়া আমার কথা শুনিতে, জাঁহাপনার কষ্ট বোধ হইতে পারে।”

সুলতান সহাস্য মুখে বলিলেন,—"না—একটুও না। তোমার অতীত কার্য্যাবলী দেখিয়া আমার মনে একটা ভয়ায়ক কৌতূহল জাগিয়া উঠিতেছে। তোমার পিতার সহিত আমার খুব জানাশুনাই ছিল। আমি আশা করি, তুমি আমাকে পিতৃবন্ধু জ্ঞানে, তোমার জীবনের সমস্ত কথা গুলি অকপটে খুলিয়া বলিবে। কোন কিছুই গোপন রাখিবে না। ভুলিয়া যাও, যে আমি বসোরার অধিপতি—নওশের জঙ্গ।"

আলি বলিল,—"জাঁহাপনা! এ প্রাণের ভিতর এক অগ্নিজ্বালাময় কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। সে আগুনে নিজেই পুড়িয়া ছার খার হইতেছি। আপনার মত সম্মাননীয় শ্রোতার কাছে, সে দুঃখময় কাহিনী বিবৃত করিলে, আমার এ জ্বালাময় প্রাণ অনেকটা শান্তিলাভ করিতে পারে। আমি প্রতিশ্রুতি করিতেছি, ইহার কোন অংশই আমি আপনার নিকট গোপন করিব না।"

"আমার পিতার জন্মভূমি কায়রো। তিনি সেখানকার একজন সম্ভ্রান্ত জহরৎ ব্যবসায়ী। কাস্‌গার, কান্দাহার, বুখারা, হিন্দুস্থান প্রভৃতি দূরতর দেশে, বাণিজ্যাদি দ্বারা তিনি প্রচুর অর্থসঞ্চয় করেন। সে কষ্টার্জ্জিত অর্থ ঠিক যেন এক সম্রাটের ঐশ্বর্য্য।

"আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। প্রথম বয়সে পিতার কোন সন্তানাদি হয় নাই—এজন্য তিনি বড়ই বিমর্ষ হইয়া থাকিতেন। তাহার কষ্টে অর্জ্জিত, এই কুবেরের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে কে, ইহা ভাবিয়া তিনি দারুণ মনোকষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

"দৈবজ্ঞগণকে প্রচুর পারিশ্রমিক দিয়া, তিনি আমার মাতাকে সন্তান হইবার কবচাদি ধারণ করাইলেন। নানা স্থানে পীরোত্তরের সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। দরিদ্রদিগকে নিত্য দান খয়রাত করিতে লাগিলেন। এই ভাবে এই সব পুণ্যানুষ্ঠানের ফলে, আমার মাতা অন্তঃস্বত্বা হইলেন। যথাসময়ে আমি ধরায় আলোক দর্শন করিলাম। পিতা, এই সময়ে আমার জন্ম উপলক্ষে এত দানখয়রাত করিলেন, যে সে কথা কায়রোর সুলতানের কর্ণে গিয়া পৌঁছিল। অবশ্য সে সময়ে আপনার সহোদর কায়রোর শাসনকর্ত্তা ছিলেন না। পিতার নিকট জ্ঞান হইলে শুনিয়াছি, সে সময় যিনি সুলতান ছিলেন—তাঁহার নাম আস্‌গার মহম্মদ বেগ।

"দেশাধিপতি আসগার মহম্মদ একদিন আমার পিতাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমার শাসিত রাজ্যের মধ্যে শুনিয়াছি, তুমি একজন শ্রেষ্ঠ বণিক্। তোমার ধনাগার নাকি সুলতানের রাজকোষের তুল্য। আমি তাহা একদিন দেখিতে ইচ্ছা করি।'

আমার পিতা দেশাধিপের এই কথায় বড়ই ভয় পাইলেন। কিন্তু তিনি চতুরতার সহিত প্রকৃত মনোভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বলিলেন 'জাঁহাপনা! আজ হইতে আমাকে পনর দিন সময় দিন। আমি আমার ধনাগারকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সজ্জিত করিয়া, এই পক্ষাধিক কাল পরে, জাঁহাপনাকে সেখানে লইয়া যাইব।'

"এই অর্থগৃধ্নু অত্যাচারী সুলতানকে তাঁহার কষ্টসঞ্চিত গুপ্ত ধনাগার

দেখান পিতার অবশ্য মনোগত অভিপ্রায় ছিল না। এজন্য তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিবার জন্যই, কৌশলে এই ভাবে দীর্ঘ সময় প্রার্থনা করিয়া ছিলেন।

"পিতার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। তিনি তাহার বন্ধু বিশ্বাসী সার্থবাহগণের সহায়তায়, তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য, উষ্ট্রপৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া বসোরায় পাঠাইয়া দিলেন। তৎপরে একদিন গভীর নিশীথে আমাকে ও আমার মাতাকে সঙ্গে লইয়া ছদ্মবেশে কায়রো ত্যাগ করিলেন। কায়রোব সুলতান, এই ঘটনার চারিদিন পরে আমার পিতার পলায়ন সংবাদ অবগত হইয়া ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার সন্ধানের জন্য চারিদিকে গুপ্তচর পাঠাইলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার সন্ধান আনিতে পারিল না। আমরা যে সময়ে বসোরায় পলাইয়া আসি, সেই সময়ে এই প্রদেশে আর একজন সুলতান ছিলেন। আমার পিতা একখানি বাটী ভাড়া লইয়া প্রায় বৎসরাধিককাল গোপনে এই বসোরা নগরীতে বসবাস করেন। শেষ যথন তিনি শুনিলেন—কায়রোর পূর্ব্ব সুলতান আসগার মহম্মদের মৃত্যু হইয়াছে তখন প্রকাশ্যভাবে এই বসোরাতেই এক প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন।

"আমার বয়স যখন দশ বৎসর, তখন আমি মাতৃহীন হই। এই মাতৃহীনতার সঙ্গে, আমি পিতার বড়ই আদরের হইয়া উঠিলাম। তিনি আমাকে এত বেশী প্রশ্রয় দিতে লাগিলেন, স্নেহযত্ন করিতে লাগিলেন—যে আমি আলালের ঘরের দুলাল হইয়া পড়িলাম।

"পিতা আমায় সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই শিক্ষা আমার চরিত্র গঠনের পক্ষে একটুও সহায়তা করিতে পারিল না।

"আমার যখন বিশ বৎসর বয়স, তখন পিতা আমাকে তাঁহার ব্যবসায়-ক্ষেত্রে লইয়া গেলেন। ব্যবহারিক ভাবে এক বৎসর বাণিজ্য ব্যবসায়ের গূঢ়রহস্য শিক্ষা করিয়া, আমি অনেকটা মানুষের মত হইয়া উঠিলাম।

"এই সময়ে পিতা কোন একটা ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থলাভ করেন। এতদিন তিনি আমাকে তাঁহার গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার দেখান নাই। এখন আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছি, কর্ম্মক্ষম হইয়াছি—দেখিয়া, তিনি একদিন আমাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন—'আলি মন্‌সুর! তোমার পিতৃ-সঞ্চিত বিত্ত কত বেশী, আজ আমি তাহা তোমাকে দেখাইব। কিন্তু সাবধান—কাহারও নিকট কখনও কথাচ্ছলেও, আমার এ গুপ্ত ধন-ভাণ্ডারের অস্তিত্ব প্রকাশ করিও না। তাহা হইলে তোমার মহা বিপদ ঘটিবে!'

"পিতা একদিন গভীর রাত্রে আমাকে সঙ্গে লইয়া একটী প্রজ্জলিত বর্ত্তিকা হস্তে, সেই বাড়ীর নিম্নতলে চলিয়া গেলেন। চাবির সহায়তায়, গুপ্তদ্বার খুলিয়া, ভূগর্ভস্থিত একটী কামরার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

"এ কামরার অস্তিত্ব আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। কয়েকটী সিঁড়ি নামিয়া আসিবার পর, আমরা দুজনে আর একটী ক্ষুদ্র কক্ষদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

"এই ক্ষুদ্র দ্বারটি লৌহময়। পিতা এক রৌপ্যকুঞ্চিকা সেই দ্বারের লাগাইয়া, তাহা নিমেষ মধ্যে খুলিয়া ফেলিলেন।

"সেই ক্ষুদ্র কক্ষটীর দেয়ালগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত। তাহাতে বায়ু বা রৌদ্রপ্রবেশের জন্য একটু ছিদ্র পর্য্যন্ত নাই। সমস্ত কক্ষতল লোহিত বর্ণের মখমলে মোড়া। আর তাহার উপর পালিস্ করা কয়েকটী বড় বড় কাঠের সিন্দুক।

"সেই ভূগর্ভস্থ ধনাগারের মধ্যে, কয়েকটী অসম্ভব রকমে বড়, মধুথ বর্ত্তিকা সাজানো ছিল। পিতা তাঁহার হস্তস্থিত জ্বলন্ত বর্ত্তিকার সহায়তায়, সেই বড় বাতিগুলি জ্বালাইয়া দিলেন। সদ্যপ্রজ্বলিত বাতি-গুলির আলোকে অন্ধকারময় ভূগর্ভ যেন প্রমোদকাননের শোভা ধারণ করিল।

"একটীর পর আর একটী করিয়া, পিতা আমাকে উন্মুক্ত সিন্দুকগুলি খুলিয়া দেখাইলেন। ইহাদের কোনটী বা রত্নালঙ্কারে পূর্ণ, কোনটী বা বহুমূল্য হীরামতি পান্না চুণীতে পূর্ণ। কোনটী বা স্বর্ণ-তালে পূর্ণ, কোনটী বা স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ।

"এই ভাবে দেখানো শেষ হইলে, পিতা সেই সব রত্নমাণিক্যপূর্ণ সিন্দুকগুলি পুনরায় বন্ধ করিয়া, কক্ষের বাতিগুলি নিভাইয়া দিলেন। তারপর দ্বার বন্ধ করিয়া, উপরে চলিয়া আসিলেন।

"কক্ষমধ্যে পৌঁছিয়া পিতা আমায় বলিলেন 'মনসুর! দীর্ঘ রজনীর শেষ যাম উপস্থিত। তুমি এখন নিদ্রা যাও। তুমি আজ যে কুবেরের

ঐশ্বর্য্য দেখিলে, বোধ হয় স্বপ্নেও আজ রাত্রে ইহা তুমি আবার প্রত্যক্ষ করিবে।'

"আমি এই অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা মনোমধ্যে আলোচনা করিতে করিতে শয়নকক্ষে চলিয়া আসিলাম। শ্রান্তি নিবন্ধন শীঘ্রই আমার নিদ্রা আসিল।

"নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিলাম, যেন এক দীপ্তিময়ী স্বর্ণপ্রতিমা আমার শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিতেছে 'আলি মন্‌সুর! আমি তোমার পিতার ভাগ্যলক্ষ্মী। এক সুলতান ছাড়া তোমার পিতার ন্যায় বিত্তবান আমীর, এ বসোরা নগরীতে আর দ্বিতীয় নাই। তুমি বহু যত্নে সঞ্চিত এই কষ্টলব্ধ ঐশ্বর্য্য অপব্যয় করিও না। খুব সাবধানে চলিও। পুরুষানুক্রমে তোমার সুখে স্বচ্ছন্দে আমিরী ভাবে চলিয়া যাইবে।'

"স্বপ্নের ঘোরে আমি এই দীপ্তিময়ী প্রতিমার সকল কথাগুলি যেন অতি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। তারপর আমার শয্যা পার্শ্ব হইতে সেই লাবণ্যময়ী প্রতিমা যেন ছায়ামূর্ত্তির মত সরিয়া গেল।

"এই অপূর্ব্ব স্বপ্নের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে, আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু চিত্ত হইতে স্বপ্নের সেই সুস্পষ্ট স্মৃতিটুকু মুছিল না। আমি আমার প্রাতঃকালের করণীয় কার্য্যগুলি শেষ করিয়া, পিতার কক্ষে প্রবেশ করিলাম।

"দেখিলাম, তিনি কতকগুলি হিসাবের কাগজ-পত্র লইয়া অতি মনঃসংযোগের সহিত তাহা দেখিতেছেন। আমি নিঃশব্দে তাহার পার্শ্বের

একটী আসনে বসিলাম। তিনি জানিতেও পারিলেন না, যে আমি তাঁহার খুব নিকটই উপবিষ্ট। এতটা নিবিষ্টচিত্তে তিনি তাঁহার কার্য্য করিতেছেন! কতকগুলি লেখা ফর্দ্দের উপর তাঁহার দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ।

"আমি বুঝিলাম, সেগুলি পিতার সঞ্চিত ঐশ্বর্য্যের হস্তবুদ্। সেই গুপ্তভাণ্ডারে অতীত রজনীতে যে বহুমূল্য. রত্নগুলি দেখিয়াছিলাম, এগুলি তাহার ফিরিস্তি।

"পিতা সেই কাগজগুলি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বাঁধিয়া, পার্শ্বে মুখ ফিরাইবা মাত্র দেখিলেন, আমি তাহার অতি সন্নিকটে চুপ করিয়া বসিয়া আছি। তিনি বলিলেন—'কতক্ষণ আসিয়াছ তুমি মনসুর ?'

"আমি বলিলাম—'প্রায় দশমিনিট কাল আমি আপনার পাশ্বে বসিয়া আছি।'

পিতা। এ ফিরিস্তিগুলি কি তা জান? গতরাত্রে তোমায় যাহা দেখাইয়াছিলাম, তাহারই নিখুঁত হিসাব। ইহাতে সমস্ত মণিমুক্তার আনুমানিক মূল্য লিখিত আছে। শুনিয়াছ তো, বড় লোকের এবং আমীর লোকের পছন্দের উপর, জহরতের দাম বাড়িয়া যায়। আমি আনুমানিক যাহা ধরিয়াছি, তাহাতে আমার সমস্ত হীরা জহরতের মূল্য কোটি টাকার কম হইবে না, বরঞ্চ তাহার দ্বিগুণ হইবে।"

আমি একথা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। বিপুল সম্পদের অধিকারী আমি, একথা ভাবিয়া আমার মনে একটা অতিরিক্ত দর্প উপস্থিত হইল।

তৎপরে আমি পিতাকে গতরাত্রের অদ্ভুত স্বপ্ন-কথাটা বলিয়া ফেলিলাম। তিনি সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া গম্ভীরভাব ধারণ করিলেন।

তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন—'সেই স্বপ্নদৃষ্টা দেবী তোমায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক! অন্যায় অপব্যয় করিলেই, এই বিশাল ঐশ্বর্য্য সমূলে নাশ হইবে। কিন্তু তুমি চঞ্চলমতি অপরিণত বুদ্ধি যুবক। তোমার বয়সের যুবকদের যেরূপ সাংসারিক বিষয় বুদ্ধি হওয়া প্রয়োজন, চিরদিন আদরে পালিত বলিয়া, তাহা তোমার হয় নাই। এরূপ স্থলে তোমায় একটী কথা বলিতে চাই।'

আমি কৌতূহলাবিষ্ট চিত্তে বলিলাম—'বলুন আপনার মনের কথা কি! আমি যথাশক্তি আপনার উপদেশ পালন করিব।'

পিতা বলিলেন—'সুখের দিন যখন আসে, তখন যেমন কেহ পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারে না। সেইরূপ দুঃখের দিনের আগমন ব্যাপারও ঘোর রহস্য জড়িত। যদি কখনও কুসংসর্গে পড়িয়া, বন্ধুদের ছলনায় ও তোষামোদে, তুমি এই পিতৃসঞ্চিত কুবেরের ঐশ্বর্য্য অপব্যয় কর, তাহা হইলে তোমাকে পথে দাঁড়াইতে হইবে! আমার বিশ্বাস, তুমি মহা দুঃখের সময় অতীতসুখস্মৃতির ভাবনায় বড়ই যাতনা পাইবে। সে যাতনার জ্বালা খুবই বেশী হইবে। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী যে ছিল, সে যদি পথের ভিক্ষুক হইয়া পড়ে, তাহা হইলে অতীত সুখের স্মৃতির বোঝা লইয়া সে সর্ব্বদাই নিরাশচিত্তে আত্মনাশের চেষ্টা করে। খোদা করুন, এরূপ ভীষণ দিন যেন তোমার জীবনে কখনও না আসে। কিন্তু খোদার এই

দুনিয়ায় সবই হওয়া সম্ভব। বৎস মনসুর! যদি এমন শোচনীয় দিন কথনও তোমার অদৃষ্টে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তুমি আমার উদ্যান মধ্যে যে শুষ্ক রসাল বৃক্ষটী আছে, তাহার শাখায় রজ্জু বন্ধন করিয়া আত্মনাশ করিও। আমার অঙ্গস্পর্শ করিয়া শপথ কর, ইহার অন্যথা করিবে না।"

আমি পিতার এই অদ্ভুত আদেশ শুনিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। মনে ভাবিলাম, হয়ত অপব্যয়ের ভীষণতা, আর সুখের অবস্থা হইতে দুঃখের অবস্থায় পড়ার ভয়ানক কষ্টটা, আমায় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য, তিনি আমাকে এইরূপ অদ্ভুত অনুরোধ করিতেছেন।

আমি অঙ্গস্পর্শ করিয়া, তাঁহার ইচ্ছামত শপথ করিলাম। তিনি যেন তাহাতে একটা তৃপ্তিলাভ করিলেন। কিন্তু এটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, যে তাঁর এত যত্নের, এত আদরের পুত্রকে, তিনি দুঃখের দিনে আত্মনাশের উপদেশ দিতেছেন কেন?"

ইহার পর আরও একটী বৎসর কাটিল। পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আমার মনে বড়ই একটা গর্ব্বের আবির্ভাব হইয়াছিল। অতীব গর্ব্বিত ব্যক্তি, প্রায়ই অতিমাত্রায় তোষামোদ প্রিয় হয়। এই সময়ে আমার সমবয়স্ক দুষ্ট সঙ্গীগণ নানাবিধ শ্রুতিসুখকর কথায়, আমার মগজটাকে বিগড়াইয়া দিতে লাগিল। আমি পিতার জীবদ্দশাতেই তাহাদের ছলনায় ভুলিয়া পাপকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলাম।

এই দুষ্ট সঙ্গীবর্গ লইয়া আমোদপ্রমোদ করার কথা একদিন পিতার

কাণে উঠিল। এজন্য তিনি আমার উপর বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন। আমায় নির্জ্জনে ডাকিয়া, তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"দেখিতেছি, তোর মত দুর্ভাগ্য এ ধরায় অতি কম! এখন হইতে এরূপ মতিগতি দাঁড়াইলে উদ্ধারের আর কোন উপায়ই নাই। তুই অচিরাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবি! হায়! একটা সন্তান লাভের জন্য না করিয়াছি কি? কিন্তু তুই এমন কুসন্তান হইয়া জন্মাইয়াছিস্, যে এখন মনে হয় তুই না জন্মিলে, আমার চিত্তের সুখ নষ্ট হইত না। আমায় এ অশান্তি ভোগ করিতে হইত না।"

পিতার এই তিরস্কারে আমি বড়ই মর্ম্মপীড়া অনুভব করিলাম। তাঁহার পদযুগ ধরিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে মার্জ্জনা চাহিলাম। আর কখনও কুসঙ্গে মিশিব না, তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলাম। তিনি যেন এ কথায় একটু আশ্বস্ত হইলেন। আর তাঁহার তৃপ্তির জন্য, সন্তোষের জন্য, আমিও বাটীর বাহির হইতাম না।

(৫)

আমার বুদ্ধির দোষে আমার ভবিষ্যৎ পরিণাম যে অতি শোচনীয় হইবে, এরূপ একটা দুশ্চিন্তা পিতার চিত্তক্ষেত্রকে বড়ই অশান্তিপূর্ণ করিয়া তুলিল। তিনি কঠিন রোগপীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন।

অনেক চিকিৎসা হইল, তদ্বির চলিল, তবুও তিনি সেই করাল

রোগের হস্ত হইতে মুক্তি পাইলেন না। টাকায় যদি মানুষ বাঁচিত, তাহা হইলে বড় মানুষের বাড়ীতে মৃত্যুর করুণ ক্রন্দন জাগিয়া উঠিত না।

পিতা—তাঁহার মৃত্যুর অর্দ্ধঘন্টা পূর্ব্বে, বাকশক্তি ফিরিয়া পাইলেন। কেননা এতদিন তিনি বাক্যহীন অবস্থাতেই ছিলেন।

তাঁহার পুনরায় চৈতন্যবিকাশ দেখিয়া, আমার মনে বড়ই আনন্দ জন্মিল। তখন আমার মনে একটা আশা হইল, সে আমার পিতৃ-সম্বোধনের পথ বোধ হয় খোদা লোপ করিতে ইচ্ছুক নহেন।

পিতা হস্তেঙ্গিতে আমাকে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে ডাকিলেন। বলিলেন—"আলি মনসুর! আমার চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া, খুব বেশী আশান্বিত হইও না। তোমাকে আমার শেষ কথাগুলি বলিবার জন্য, পরম করুণাময় খোদা আমাকে এই চেতনা ফিরাইয়া দিয়াছেন। অতি শীঘ্রই আমি পরলোকের যাত্রী হইব। আজিকার এই অপরাহ্ন হয়তো কাটিবে না—একটু জল দাও বড় তৃষ্ণা!"

আমি তখনই স্নিগ্ধ পানীয় ঢালিয়া, একটু একটু করিয়া তাঁহার মুখে দিলাম। শক্তি সঞ্চয় করিয়া, তিনি বলিতে লাগিলেন—"বৎস! আমার অনেক কষ্টে সঞ্চিত এই ঐশ্বর্য্যের অপব্যয় করিও না। যদি প্রবৃত্তি দমন করিতে না পারিয়া অপব্যয়ে দুঃখের চরম অবস্থায় আসিয়া পড়, তাহা হইলে, অতি হীনের ন্যায় কাহারও কাছে হাত না পাতিয়া পূর্ব্বোক্ত আম্রবৃক্ষের শাখায় রজ্জু বাঁধিয়া আত্মহত্যা করিও। ইহাই আমার মৃত্যুর পূর্ব্বের শেষ আদেশ।"

ইহার অর্দ্ধঘণ্টা পরে, আমার পিতার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তিনি সংসারের সকল দুঃখ ভোগ করিবার জন্য, আমার মত হতভাগ্য সন্তানকে দুনিয়ায় রাখিয়া, বেহেস্তে চলিয়া গেলেন। আমি বালকের মত, পিতার মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

সময়ের মত, শোকের নিদান পারদর্শী চিকিৎসক আর নাই। দেখিতে দেখিতে এক মাস কাটিয়া গেল। এই একমাস আমি শোকাচ্ছন্ন অবস্থা-তেই ছিলাম। জন-সমাজে কাহারও সঙ্গে মিশি নাই, বন্ধুবর্গের সহিত দেখা করি নাই। কিম্বা কোন প্রকার আমোদ উৎসবে লিপ্ত হই নাই।

সময় কাহারও অপেক্ষা করে না। সময় কাটিতে লাগিল, আর সময়ের গুণে আমিও পিতৃশোক ভুলিয়া, আবার সংসারের আমোদপ্রিয় জীবের দলে আসিয়া মিশিলাম।

এই সময়ে সুযোগ পাইয়া আমার কুসঙ্গীগণ, আবার আমার পার্শ্বে আসিয়া জড় হইল। তোষামোদ করিয়া, তাহারা আমাকে সপ্তম স্বর্গে তুলিতে লাগিল। কেননা—তখন এ জগতে আমার অব্যাহত ইচ্ছায় বাধা দিবার কেহ নাই।

আমি অবিবাহিত। পিতা আমায় সংসারী করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি নানা আপত্তি তুলিয়া, তাহাতে স্বীকৃত হই নাই।

যৌবনের উদ্দাম প্রবৃত্তিগুলি পূর্ণ শক্তিতে জাগিয়া উঠায়, আমি এই

সব কুসঙ্গীদের শক্তিকে বাধা দিতে পারিলাম না। এ অবস্থায় অপরিণামদর্শী যুবকের যে সব দশা হইয়া থাকে, আমারও তাহাই হইল।

জ্ঞানীদের কথা এই—যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব আর অবিবেকতা, চারিটী এক সঙ্গে জুটিলে, অতি সংযত সাধুচরিত্রেরও পতন অবশ্যম্ভাবী। আমার যখন ঠিক এই অবস্থা, তখন অধঃপতন ঘটিবে না কেন?

তন্বঙ্গী ষোড়শী লইয়া নিত্য আমোদ প্রমোদ, দিবারাত্র সুন্দরীগণ পরিবৃত হইয়া টাইগ্রীস্ বক্ষে নিশীথকালে জলবিহার, নিত্য ভোজ ও খানা, এই সব অপব্যয়ে দুই চারি বৎসরের মধ্যে পিতৃসঞ্চিত সেই কুবের ভাণ্ডার শূন্য হইয়া পড়িল। কোথায় দিয়া যে সেই যক্ষের সঞ্চিত ধন, কর্পূরের মত উপিয়া গেল, আমি তাহার কিছুই জানিতে পারিলাম না।

দীপালোকিত উজ্জ্বল নাট্যশালার অভিনয় শেষ হইলে, তাহা যেমন যেমন একেবারে জনশূন্য ও অন্ধকারময় হইয়া পড়ে, কোলাহলসংকুল, নিত্য প্রমোদোল্লাসপূর্ণ, আমার আবাসভবনও, আমার ঐশ্বর্য্যাপচয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারময় হইয়া উঠিল।

যাহাদের আমি সৌভাগ্যের সঙ্গী, অভিন্নহৃদয় বন্ধু জ্ঞানে সুখের দিনে ঋণ দিয়াছিলাম, দারুণ অর্থাভাবে পড়িয়া তাহাদের নিকট আমার প্রাপ্য চাহিতে গেলাম। তাহারা টাকার কথা একেবারে অস্বীকার করিল। যাহার কাছে কোন কিছুর জন্য হাত পাতিতে যাই; সেই আমার কটু কাটব্য বলে, অপমান্ করিয়া, তাড়াইয়া দেয়।

প্রতি গৃহদ্বার হইতে এইভাবে কুকুরের মত বিতাড়িত হইয়া, আমার মনে যথেষ্ট ঘৃণা ও অনুশোচনা দেখা দিল। আমি লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলাম। কিন্তু তাহাতেও আমার নিস্তার নাই।

এই সময়ে বাজারেও যথেষ্ট ঋণ হইয়াছিল। যাহারা এক সময়ে আমার বন্ধু বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহাদেরই গুপ্ত উত্তেজনায় পাওনাদারেরা আমার নামে কাজির নিকট নালিশ করিল।

কাজির আদালতে, যোত্রহীন দেনাদারের দণ্ড অতি ভয়ানক। কোড়ার নিষ্ঠুর আঘাতে মৃতকল্প হইয়া পড়িতে হয়। আমার মনে সেই ভীষণ রাজদণ্ডের আশঙ্কাটাই বেশী প্রবল হইল।

মনে ভয়ানক ধিক্কার জন্মিল। ভাবিলাম, এ সন্তপ্ত হতভাগ্য জীবনভার বৃথা বহন করিয়া ফল কি ?

এই সময়ে পিতার শেষশয্যার শেষ উপদেশটী সহসা আমার মনে জাগিয়া উঠিল। মনে ভাবিলাম, পিতার প্রথম উপদেশ লঙ্ঘন করিয়াই যখন আমার এ দুর্দ্দশা, তখন তাঁহার দ্বিতীয় উপদেশ আর লঙ্ঘন করিব না। স্নেহময় পিতা, দিব্যচক্ষে আমার শোচনীয় পরিণাম, আর তাহার অনুসঙ্গী যাতনার প্রভাব বুঝিয়াই, আমাকে এই উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। মনে সংকল্প স্থির করিলাম, সেই দিনই আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালার অবসান করিব। আমি রাত্রির আগমন অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

বান্দা-বাঁদী সবাইকেই জবাব দিয়াছি। আমার সেই বিশাল পুরীতে আমি আর আমার বৃদ্ধা দাই ভিন্ন আর কেহই রহিল না।

এই বৃদ্ধা দাই, অতি শিশুকাল হইতেই আমায় লালনপালন করিয়াছিল। মাতৃবিয়োগের পর, আমি তাহাকেই মা বলিয়া জানিতাম। সবাই আমাকে ত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু মাতৃরূপিণী এই ধাত্রী তখনও আমায় ত্যাগ করে নাই।

রজনীর মধ্যযাম উত্তীর্ণ প্রায়। সন্ধ্যা হইতে এই মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত আমি একভাবেই চিন্তা করিয়াছি—"পিত্রাদেশ পালন করিব কি না? মরিব কি বাঁচিয়া থাকিব?"

দাই আহার করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছিল। 'শরীর অসুস্থ কিছু খাইব না' বলায় সে নিজের কক্ষে চলিয়া গিয়াছে।

দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তায় ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যসম্বন্ধে কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম। তন্দ্রায় স্বপ্ন দেখিলাম, কাহারা যেন সজোরে আমার বহির্দ্বারে প্রচণ্ড বেগে পদাঘাত করিতেছে। সেই পদাঘাতের চোটে দরোজা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি সবিস্ময়ে ভীতিবিহ্বল চিত্তে দেখিলাম—ভীমকায়, মায়ামমতাহীন কাজির অনুচর পদাতিকেরা আসিয়া আমাকে অতি নিষ্ঠুরের মত বন্ধন করিতেছে।

ভয়ে চীৎকার করিয়া বলিলাম—"মেহেরবান্ খোদা! রক্ষা কর!" কিন্তু চক্ষু মার্জ্জনার পর স্বপ্নের মোহ অপসৃত হইল।

তখনই আবার অবসন্ন প্রাণে সাহস সঞ্চয় করিলাম। মনে ভাবিলাম

যতদিন বাঁচিব, এই ভাবেই আমাকে কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। দেখিতেছি, মরণ ভিন্ন শান্তি লাভের উপায়ান্তর আর নাই!

বাতায়নপথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। শীতল নৈশবায়ু, আমার মস্তিকের এই উত্তেজনাময় অবস্থার তীব্রভাবটা, যেন একটু কমাইয়া দিল।

নীলাকাশে অসংখ্য তারা জ্বলিতেছে। তবুও যেন সেই অনন্ত বিস্তৃত-সীমাহীন সুনীল আকাশে, মৃত্যুর কালিমামাখা একটা বিকটান্ধকার ব্যাপিয়া আছে। তারাগুলির একটীও নিভে নাই, আমিই কেবল অন্ধকারে ডুবিতেছি। অসংখ্য সমুজ্জ্বল তারকা, যেন আমাকে বিদ্রুপ করিয়া বলিতেছে—"কোথায় তোমার সেই সুখের দিন, যে দিন তুমি শান্তিস্নিগ্ধ প্রাণে আমাদের দিকে চাহিয়া থাকিতে! ছি! ছি! আজ আমাদের দিকে চাহিতে তোমার কি একটুও লজ্জা করিতেছে না?"

নৈশসমীরণ যেন গভীরস্বননে আমার কাণের কাছে বলিয়া গেল—"হতভাগ্য! তোমার সুখের দিনে আমিই যে, সদ্যপ্রোদ্ভিন্ন নিশীথ কুসুমের সুবাস চুরি করিয়া, তোমার নাসারন্ধ্রে ধরিয়া দিয়াছি। আজ কোথায় তোমার সে সুখের দিন?"

অদূরে টাইগ্রীস্ ভীমকল্লোলে আপনমনে অনন্তের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। অসংখ্য তরঙ্গ তাহার বুকে। প্রতিধ্বনি যেন সেই তরঙ্গ-সঙ্গীতের ভাষাকে প্রাণময়ী করিয়া, আমার কর্ণকুহরে পৌছাইয়া দিল। তরঙ্গ যেন বলিতেছে—"হতভাগ্য আলি মনসুর! আজ কোথায় তোমার সেই সুখের দিন; যেদিন অসংখ্য তীব্র কটাক্ষশালিনী সুন্দরীর অংসোপরি

মাথা রাখিয়া, আমার তরঙ্গগুলিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়া, জলবিহার করিয়া বেড়াইতে? তোমার এ অবস্থা দেখিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইতেছে। এসো! তুমি জ্বালাময় জীব, আমার বুকে। তোমার সকল জ্বালার বিরাম হইবে।"

বসোরা নগরীর অনেক প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার উজ্জ্বল দীপাবলী তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। সে সমুজ্জ্বল আলোকরেখা, টাইগ্রীসের অন্ধকারময় বুকের উপর পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতেছিল। পুষ্পবাসিত উষ্ণনিশ্বাসময় কক্ষ হইতে অসংখ্য রমণীকণ্ঠনিঃসৃত সুধামাখা সঙ্গীত ধ্বনি, প্রতিধ্বনির বুকে চড়িয়া দিকদিগন্তে বিলীন হইতেছিল। সে প্রতিধ্বনি যেন বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছে, একদিন তোমারও এই অবস্থা ছিল! দেখ আজ তার কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন।

জড় প্রকৃতির এই সমবেত তিরস্কার, আমাকে আরও উত্তেজিত করিল। আমি মরণের পথে অগ্রসর হইবার জন্য, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলাম।

ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিলাম। দাই—উপরের একটী কক্ষে থাকিত। পাছে সে জাগিয়া উঠিয়া আমার সাধের মরণে বাধা জন্মায়, এই ভাবিয়া আমি অতি সন্তর্পণে, তাহার দ্বারের শিকলটী বন্ধ করিয়া দিয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মনে ভাবিলাম—বিষপানে অগ্নিদাহে, জলমজ্জনে মৃত্যু অপেক্ষা, এই উদ্বন্ধনে মৃত্যু কত সুখের! রজ্জু সংগ্রহ করিতে আমার বেশী কষ্ট হইল না। সামান্য চেষ্টাতেই তাহা মিলিল।

পিতার নির্দ্দিষ্ট সেই বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ভয়ে বুকটা খুবই কাঁপিয়া উঠিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। আবার স্বপ্নে দৃষ্ট কাজীর সেই কারাগারের ও পীড়নের ভীষণ দৃশ্য, আমার চোখের সম্মুখে মৃত্যু বিভীষিকা বিস্তার করিল। আমি আতঙ্কে আত্মহারা হইলাম।

কিন্তু অনর্থক সময়ক্ষেপের সময় ত আর নাই। এখনই হয়ত কেউ না কেউ এখানে আসিয়া পড়িতে পারে। আমার এই সাধের মরণে বাধা ঘটিতে পারে?

ইহা ভাবিয়া আমি সেই পিতৃনির্দ্দিষ্ট শুষ্ক বৃক্ষ শাখায় রজ্জু বাঁধিলাম। কেন না পিতা বলিয়াছিলেন, "গাছের মধ্যে যে শাখাটী খুব মোটা আর একাবারে শুখাইয়া গিয়াছে, তাহাতেই রজ্জু বাঁধিয়া আত্মনাশ করিও।"

বলিব কি আপনাকে বসোরাধিপ! দুর্ভাগ্য যে—মৃত্যুও তাহার উপর বিরূপ। আমি মরিয়া বাঁচিব বলিয়া, রজ্জুর ফাঁস গলদেশে দিলাম, কিন্তু আমার ক্ষীণ দেহের ভারে সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষশাখা মহাশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কঠিন মৃত্তিকার উপর পড়িয়া গিয়া, আমি খুব একটা কঠিন আঘাত পাইয়া মূর্চ্ছিত হইলাম।

কতক্ষণ এ অবস্থায় ছিলাম, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। চেতনা হইলে বুঝিলাম—আমি তখনও সেই কঠিন মৃত্তিকা শয্যার উপর পড়িয়া আছি। আর আমার আশে পাশে, অনেকগুলা কি যেন আলেয়ার মত ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

শক্তি সঞ্চয় করিয়া আমি বহুকষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নিকটে

জলপূর্ণ এক ক্ষুদ্র নাহার ছিল। সেই নাহার হইতে মুখে চোখে ও মাথায় প্রচুর জলসেক করিয়া, আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলাম।

যে জিনিসগুলি আমার চারিদিকে জ্বলিতেছিল, বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণের পর বুঝিলাম, সেগুলি সমুজ্জ্বল রত্নরাজি। তাহার মধ্যে, নীলা, পদ্মরাজ, হীরক পোখ্‌রাজ ও চুনি-পান্নার ভাগই বেশী।

তখন পিতার অধমাধম সন্তান আমি, স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, কেন সেই উদ্যানে অতগুলি গাছ থাকিতেও পিতা আমাকে সেই শূন্যগর্ভ রসাল বৃক্ষের শাখাতে রজ্জু বাঁধিয়া মরিতে উপদেশ দিয়াছিলেন! পূর্ব্ব হইতেই আমার ভবিষ্যৎ শোচনীয় পরিণামের একটা অনুমানগত সিদ্ধান্ত করিয়া, এই শূন্যগর্ভ বৃক্ষশাখার কোটর দেশে, এতগুলি বহুমূল্য জহরৎ তিনি আমার জন্য লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন!

আমি এই অভূতপূর্ব্ব দৈব উপায়ে প্রাপ্ত, অনেকগুলি বহুমূল্য জহরত পাইয়া যে কি পরিমাণে আনন্দলাভ করিলাম, তাহা বলিতে পরি না।

জীবনব্যাপী শিক্ষায় আমি বুঝিয়াছিলাম, টাকা থাকিলেই বন্ধু পাওয়া হয়। টাকা থাকিলেই আত্মীয় আপনি আসিয়া দেখা দেয়। টাকা থাকিলেই, এ দুনিয়ার যত সম্মান ও সুখভোগ। কিন্তু টাকা না থাকিলেই ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থা হইয়া থাকে। এ শিক্ষার বহুমূল্য ফল, আমি জীবনেও ভুলিলাম না।

মণিকারের পুত্র আমি। পিতার সঙ্গে ব্যবসার কাজ শিখিয়াছিলামও কিছুদিন। কাজেই বহুক্ষণ ধরিয়া সেই জহরৎগুলি লইয়া নাড়াচাড়া

করিবার পর, মোটামুটি পরীক্ষায় আমি বুঝিয়াছিলাম, যে এ গুলি বিক্রয় করিলে, কিছু কম না হয় ত পঞ্চাশ হাজার টাকা, আমার হস্তগত হইতে পারে।

আমি তখনই সেই বহুমূল্য জহরতগুলি আমার উষ্ণীষের বস্ত্রে বাঁধিয়া লইয়া, অতি সন্তর্পণে আশাপ্রমোদিত চিত্তে উপরে চলিয়া গেলাম।

দাই যে ঘরে ঘুমাইতেছিল, তাহার শিকলটি খুলিয়া দিয়া নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, জননীরূপিণী ধাত্রী আমার তখনও অঘোরে ঘুমাইতেছে।

ভাবিলাম, এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে এত ব্যাপার ঘটিয়া গেল, তাহা খোদার এই বিশাল দুনিয়ার কোন জীবই জানিতে পারে নাই। এত দুঃখের মধ্যেও কত সৌভাগ্যবান আমি!

নিশ্চিন্ত চিত্তে, বোঝাহীন প্রাণে, নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলাম। শয্যায় শয়নের পূর্ব্বে, ঋণের একটি আনুমানিক হিসাব করিয়া বুঝিলাম—আমার বাজার-দেনা, তিন সহস্র পঞ্চাশ মুদ্রা মাত্র।

মনে মনে সংকল্প স্থির করিলাম, প্রভাতে উঠিয়াই এই বসোরা সহরের শ্রেষ্ঠ মুকিমের বিপণীতে, কয়েকখানি জহরৎ বিক্রয় করিয়া নীচস্বদয় পাওনাদারদের ঋণ শোধ করিয়া দিব। তার পর জন্মের মত এই বসোরা ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। যদি কখনও চেষ্টা ও স্বাবলম্বনে অবস্থার উন্নতি করিতে পারি, পিতার মত ধনবান হইতে পারি, যাহা নষ্ট করিয়াছি

তাহার অপেক্ষা বেশী সঞ্চয় করিতে পারি, তাহা হইলে বসোরায় আবার মুখ দেখাইব।

(৬)

নিদ্রাহীন নেত্রে, স্থিরভাবে একটী মখমলমণ্ডিত তাকিয়ায় ঠেস দিয়া, মহাপরাক্রান্ত বসোরাধিপতি, আমার এই অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিতেছিলেন।

আমি বুঝিতে পারিলাম, প্রভাত হইয়াছে। কেন না এই গহ্বর মধ্যস্থ ক্ষুদ্র কক্ষগুলির মধ্যে, প্রভাতসূচনার অগ্রদূতরূপী সূর্য্যালোক প্রবেশের পথ আমি রাখিয়াছিলাম। সে রন্ধ্রপথটী, টাইগ্রীস নদীর দিকে ছিল বলিয়া, সহসা তাহা নজরে পড়িত না।

কক্ষ মধ্যে ক্ষীণ সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে দেখিয়া, বসোরাধিপতি বলিলেন—"আলি মনসুর! তোমার এ অদ্ভুত জীবনকাহিনী অর্দ্ধেক শেষ হইয়া আসিয়াছে—কেমন কিনা?"

আমি জোড় হস্তে বলিলাম—"জাঁহাপনা! মুল্‌কে-মালিক! বান্দার জীবনের প্রথমাংশের কথা শেষ হইয়াছে। কিন্তু এইবার যাহা বলিব, তাহাতেই আমার হতভাগ্য জীবনের শোচনীয় ঘটনাময় বিচিত্র কাহিনীর নূতন সূচনা হইবে।

বসোরাধিপতি বলিলেন—"আমি তোমাকে দোস্ত বলিয়া সম্বোধন

করিতেছি। আশাকরি, তুমি আমার একটী সামান্য অনুরোধ রাখিতে অসম্মত হইবে না।"

আমি বলিলাম—"জনাব! আপনার আদেশ পালনে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। মহাপরাক্রান্ত বসোরাধিপের সামান্য প্রজা বই আমি আর কিছুই নই।"

বসোরাধিপ সহাস্যে বলিলেন—"তাহা হইলে গত রাত্রে আমরা যেমন তোমার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছি—আশাকরি, যতদিন না তোমার এই কাহিনী শেষ হয়, তুমি আমার প্রাসাদে আতিথ্য স্বীকার করিবে।"

আমি বলিলাম—"জাঁহাপনা! আমি তাহাতেই স্বীকৃত হইলাম। আজ রাত্রে আমিই আপনার প্রাসাদে রাত্রি দশটার সময় উপস্থিত হইব।"

বসোরাধিপ গম্ভীর মুখে বলিলেন—"এত রাত্রি করিয়া যাইবার কারণ যে কি, তাহা আমি বুঝিয়াছি। কিন্তু মনসুর! আজ যেন আমার জ্যেষ্ঠকে ওরূপ অভিশাপ বাক্যে জর্জ্জরিত করিও না।"

আমি বসোরাধিপের মুখে এ কথা শুনিয়া, বিশেষ লজ্জাবোধ করিলাম। সুলতান তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"না—না, নিত্য কর্ত্তব্য যে ভাবে করিলে তোমার প্রাণের শান্তি হয়, সেই ভাবেই করিও। আর আমার প্রাসাদমধ্যে অবাধ প্রবেশের জন্য, আমি তোমাকে একটী নিদর্শন দিয়া যাইতেছি। এটী তুমি প্রবেশদ্বারের প্রহরীকে দেখাইলেই সে তোমাকে সরাসর আমার নিকট হাজির করিবে।"

এমন সময়ে সুলতানের প্রধান শরীর-রক্ষী আলমামুন, সেই স্থানে

আসিয়া বলিল—"বসোরাধিপতি দীর্ঘজীবি হউন! কাল বোধ হয় জাঁহাপনার চোখ বুজিবার একটুও ফুরসুৎ হয় নাই।"

সুলতান শিরঃসঞ্চালন করিয়া, আলমামুনের কথার সমর্থন করিলেন। তৎপরে বলিলেন—"আলমামুন! আমার পাঞ্জা তোমার কাছে আছে না? দাও দেখি—সেখানি আমায়।"

আলমামুন, তখনই বক্ষবসন মধ্য হইতে এক স্বর্ণখচিত ক্ষুদ্র পাঞ্জা বাহির করিয়া, সুলতানের হাতে দিল। সুলতান তাহা আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"এখানি হারাইও না। পুরীপ্রবেশের ইহাই তোমার অভিজ্ঞান চিহ্ন।"

এই কথা বলিয়া সুলতান উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমায় বলিলেন "তাহা হইলে আমাদের এইবার এই তয়খানায় বাহির করিয়া দাও। যাইবার সময়েও আমাদের চোখ বাঁধিতে হইবে নাকি?"

আমি নতজানু হইয়া সুলতানকে বলিলাম,—"এ বান্দার গুস্তাখি মাফ্ হউক। একান্তই অসন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে আমি এ প্রথার প্রত্যাহার করিতে বাধ্য।"

সুলতান সহাস্যে বলিলেন,—"না—না—বসোরাধিপ সুলতান নওশের জন্য, ওরূপ অন্যায় অনুরোধের পক্ষপাতী নহেন। তোমার এই ক্ষুদ্র রাজ্যে আমরা তোমার ব্যবস্থাই মানিয়া চলিব।"

বলা বাহুল্য, আমি পূর্ব্ব রাত্রের মত তাঁহাদের চক্ষু বন্ধন করিয়া আমার আবাস গুহার বাহিরে পৌছিয়া দিলাম।

সুলতান ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়ের অশ্ব তিনটী যেখানে বাঁধা ছিল, আমি তাঁহাদের সঙ্গে সেই পর্য্যন্ত গেলাম। সুলতানকে কুর্ণীস করিয়া স্বস্থানে ফিরিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে তিনি বলিলেন—"এই পাহাড়ের নীচেই, আজ রাত্রে তোমায় প্রাসাদে লইয়া যাইবার জন্য একখানা নৌকা বাঁধা থাকিবে। আর এই আলমামুনও সেই নৌকায় উপস্থিত থাকিবে। রাজপ্রাসাদে যাইতে তোমার কোন কষ্টই হইবে না। জানিও আলি মনসুর! তুমি যতক্ষণ না যাইবে, ততক্ষণ আমি অভুক্ত অবস্থায় থাকিব।"

আমি সসম্ভ্রমে যুক্তকরে বলিলাম—"আমার পরম সৌভাগ্য নরনাথ! যে আপনি আমার মত এক নগণ্য জীবকে এতটা সম্মানিত করিলেন। আপনাকে গতরাত্রে আমি যথেষ্ট কষ্টই দিয়াছি। এজন্য যুক্তকরে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।"

সুলতান সহাস্যে বলিলেন—"না না তোমার কোন অপরাধই হয় নাই। যদি কখন অপরাধ কর, তাহা হইলে তজ্জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আদাব!"

সুলতান ও তাঁহার শরীররক্ষকগণ নাতি প্রশস্ত উপত্যকাপথে উপস্থিত হইয়া, পাহাড় হইতে নীচে নামিয়া গেলেন।

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, নদীতীরে একখানি সুচিত্রিত ও সুসজ্জিত তরণী রহিয়াছে। তাঁহারা অশ্ব সমেত সেই নৌকায় উঠিলেন দেখিয়া, আমি পুনরায় তম্বুখানার মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

দেখিতে দেখিতে দিন কাটিল। রাত্রি আসিল। যথাসময়ে আমি

আমার নিত্য করণীয় যাহা কিছু, তাহা শেষ করিলাম। গোলাম আব্বাস বলিয়া এক মহাশক্তিশালী খোজা আমার পুরীরক্ষক। তাহাকে বলিয়া গেলাম—"আব্বাস! আজ রাত্রে আমি বাড়ীতে ফিরিব না। খুব সাবধানে থাকিও।"

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। অন্ধকার রাশি মথিত করিয়া, নদী-তীরে আসিলাম। কেননা-এই পর্ব্বতে উঠিবার ও নামিবার পথ, আমার বিশেষ পরিচিত।

দেখিলাম, সুলতানের ব্যবস্থামত, একখানি ক্ষুদ্র নৌকা, নদীতীরে বাঁধা রহিয়াছে। আমাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়াই যে লোকটী নৌকার উপর বসিয়াছিল—সে নীচে নামিয়া আসিয়া সম্মানের সহিত আমাকে নৌকায় তুলিয়া লইল। দেখিলাম এ ব্যক্তি—আলমামুন।

যথা সময়ে আমরা টাইগ্রীসের অপর পারে পৌঁছিলাম। অপর পারেই মহপরাক্রান্ত সুলতানের প্রমোদভবন! আলমামুন আমাকে রাজপুরীর মধ্যে লইয়া গেল। তবুও প্রবেশ পথের প্রত্যেক মোহাড়াতেই আমাকে সেই সুলতানী পাঞ্জাখানি দেখাইতে হইয়াছিল।

আজ আমি বসোরাধিপের অতিথি। যে কক্ষে আমাদের আহারের স্থান হইয়াছিল, তাহার সজ্জা দেখিয়া আমি বিস্ময়মোহিত হইলাম। পূর্ব্বরাত্রে সুলতান মৎসংগৃহিত আহার্য্যগুলির বড়ই সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি দেখিলাম, আমার জন্য তিনি সকল ঋতুর সুমিষ্ট ফলই একত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাকেই বলে বাদসাহী কাণ্ড!

আহারান্তে, আমরা এক নির্জ্জন কক্ষে, সুখাসনে উপবেশন করিলাম। বসোরাধিপ বলিলেন—"যুবক! উৎকৃষ্ট বসোরাই সেরাজি তোমার জন্য আনাইয়াছি। বন্ধুত্বের চিহ্ন স্বরূপ আমরা দুইজনে, এস এক এক পাত্র পান করি।"

সুলতান তখনই তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী এক সুন্দরী বাঁদীকে ইঙ্গিত করিলেন। সে এক ক্ষুদ্র স্বর্ণভৃঙ্গারে সুগন্ধিত মদিরা লইয়া আসিল। আর স্বর্ণনির্ম্মিত পানপাত্রে সেই মদিরা ঢালিবামাত্র, কক্ষ সুবাসাকুলিত হইয়া উঠিল।

সুলতান সহাস্যমুখে বলিলেন—"দেখ আলি! আমার এই সেরা রাজধানী বসোরার তিনটী জিনিস, জগতের মধ্যে খুব বিখ্যাত। প্রথম-গুলাব—দ্বিতীয় এই গুলাববাসিত সেরাজী, তৃতীয় গুলাবের মত আরক্ত গণ্ড রসরাই সুন্দরী। এই পুষ্পাধারে রাশীকৃত গুলাব তোমার জন্য সংগৃহিত হইয়াছে। এই মদিরা রাজ-প্রাসাদে ব্যবহারের জন্য বিশেষ তরিবতের সহিত প্রস্তুত। আশা করি, ইহা তোমার মনে এমন একটা স্ফূর্ত্তিও প্রফুল্লতার ভাব আনিয়া দিবে, যাহা তোমার অদ্ভুত জীবন কাহিনী নিঃসঙ্কোচে বলিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

আমি পানপাত্র হস্তে লইয়া সুলতানের মঙ্গলকামনা করিয়া, তাহা নিঃশেষ করিয়া ফেলিলাম।

সুলতান বলিলেন—"আলি মনসুর! তোমার জীবন কাহিনীর প্রথমাংশ যাহা কাল রাত্রে শুনিয়াছি, তাহা অতি অদ্ভুত। তুমি যেন

তাহা উপন্যাসের মত বলিয়া গিয়াছিলে। বাকী অংশটী শুনিবার জন্য, আমি বড়ই উৎসুক। রাত হইয়া পড়িতেছে। কাহিনী আরম্ভ করিয়া দাও।

আমি বলিলাম—"সুলতান! অদ্ভুত উপায়ে এই গুপ্ত ঐশ্বর্য্য পাইয়া আমি বুঝিলাম, সেই করুণাময় বিধাতা আমার মত হতভাগ্যের উপর অতি সদয়। আমি দুঃখের জ্বালায় আত্মহত্যার চেষ্টা করিতে গিয়াছিলাম আর মৃত্যুই সে চেষ্টার অনিবার্য্য পরিণাম ফল। কিন্তু সেই মৃত্যু হইতে খোদা এক অতি অসম্ভব উপায়ে আমায় রক্ষা করিলেন। কেবল তাহাই নয়, আমি আবার সৌভাগ্য ফিরিয়া পাইলাম।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া, আমার পিতৃবন্ধু এক মহাজনের গদিতে গেলাম। ইনি আমার একজন অতি শুভানুধ্যায়ী। আমার দুর্ম্মতি দেখিয়া, বহুবার ইনি আমায় সদুপদেশ দিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তখন তাঁহার কথা শুনি নাই।

তাঁহার নিকট আমার কিছুই গোপন করিবার ছিল না। আমি অকপট ভাবে তাঁহার নিকট পূর্ব্বরাত্রের সমস্ত ব্যাপারই বিবৃত করিলাম। মৃত্যুমুখ হইতে এই ভাবে আমার অদ্ভুত পরিত্রাণের কথা শুনিয়া তিনি বড়ই সুখী হইলেন।

আমার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে, স্নেহময় স্বরে তিনি বলিলেন— "মনসুর! তোমার পিতা অতি ধর্ম্মাত্মা লোক ছিলেন। তাঁহার পুণ্যফলেই তুমি মহা দূরবস্থার সময়ে এই বহুমূল্য রত্নগুলি পাইয়াছ। এখন হইতে বুঝিয়া সুঝিয়া চলিলে, তুমি আবার তোমার নষ্ট ভাগ্য

ফিরিয়া পাইতে পার। আমার ইচ্ছা, কিছু অর্থ লইয়া তুমি তোমার পিতার জন্মভূমি, সেই কায়রো নগরীতে বাণিজ্যার্থে যাও। যে সুলতান তোমার পিতার শত্রু ছিলেন, তিনি এখন লোকান্তরে। এখন তাঁহার উজীর সমশেরজঙ্গ কায়রোর দণ্ডমুণ্ডবিধাতা। নূতন সুলতান বিলাস-ব্যসনেই মত্ত। রাজকার্য্যের তিনি কিছুই দেখেন না। এই সমশেরজঙ্গ যাহা করে তাহাই চলিয়া যায়। সৌভাগ্যলক্ষ্মী লাভ করিতে হইলে, তোমার পিতার পুণ্যময় ভাগ্যক্ষেত্র সেই কায়রোতে, তোমার একবার যাওয়া উচিত।"

আমি পিতৃবন্ধুর কথা শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। জহরতগুলি পরীক্ষান্তে তিনি বলিলেন—"তুমি ইহার মূল্য ধরিয়াছ কত?"

আমি বলিলাম—"পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা।"

মহাজন। না—তোমার অনুমান ভ্রান্ত। আমি এই কাজ করিয়া চুল পাকইয়াছি। এ গুলির পরিবর্ত্তে আমিই তোমাকে একলক্ষ মুদ্রা এখনি দিতে পারি। কেননা অতি বেদাগ জহরৎ এ গুলি।

আমি এই কথা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইলাম। মনে ভাবিলাম এই লক্ষ মুদ্রার সহায়তায় আমি পুনরায় আমার ভাগ্যকে গড়িয়া তুলিব। মহাজনকে বলিলাম—"মহাশয়! এ গুলি এখন আপনার কাছে গচ্ছিত থাক। আমি কেবল দুই চারিখানি জহরৎ এখন সঙ্গে লইতে চাহি। সুদূরে যাইতে হইলে, প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে লওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা মরুক্ষেত্র মধ্যে দস্যুভয় বড় বেশী। আমি কায়রো পৌছিয়া, তিন চারি

খানি দামী জহরত লইয়া বাণিজ্য আরম্ভ করিব। তারপর টাকার প্রয়োজন হইলে, আপনাকে সংবাদ পাঠাইব। আপনি কায়রোর কোন মহাজনের গদীতে বরাতি-চিঠি দিলেই চলিবে।”

এই মহাজন আমার পিতৃবন্ধু ও অতি ধার্ম্মিক। তিনি তাঁহার পাকা খাতায়, আমার নামে সেই জহরৎগুলি জমা করিয়া লইলেন। তার পর প্রসন্নমুখে বলিলেন—“ভাল! তাহাই কর। এটা খুব সুযুক্তির কথা। কিন্তু এবার খুব সাবধান! জানিও, কায়রো বিলাসের প্রধান কেন্দ্র। অসংখ্য বিলাসিনী, সেখানে প্রলোভনজাল বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে। খুব সাবধানে চলিবে মনসুর! তাহা হইলে তোমার ভাগ্য ফিরিবে। কিন্তু প্রবৃত্তির বাঁধ বাঁধিতে না পারিলে, এই প্রলোভনময় কায়রো সহরে তুমি একমাসও টিকিতে পারিবে না। তোমার যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট হইবে, এমন কি তোমার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইতে পারে।”

আমি তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া বলিলাম—“আপনি পিতৃবন্ধু। আপনার উপদেশ আমি চিরদিন মাথায় রাখিব। আমার তুইটী মাত্র অনুরোধ আপনার কাছে আছে। তখন আমি আপনার হিতবাক্য শুনি নাই—তাহার ফলও যথেষ্ট পাইয়াছি। আপনি আমার পূর্ব্বাপরাধ মার্জ্জনা করুন।”

মহাজন, স্নেহভরে আমার হাত তুখানি ধরিয়া বলিলেন—“বল বৎস! কি তোমার অনুরোধ? আমি তোমাকে সন্তানতুল্য জ্ঞান করি। তোমার যখন বাল্যবস্থা, তখন তোমাদের বাড়ীতে গিয়া তোমায় আমি কতবার

স্নেহভরে কোলে করিয়াছি। তোমার কোন ন্যায্য অনুরোধ পালনেই আমি অস্বীকৃত হইব না।"

আমি বলিলাম—"আমাকে এখন দুই সহস্র মুদ্রা দিন। আমি এখানকার বাজার দেনা পরিশোধ করিয়া কায়রো চলিয়া যাই। আর আমার পালয়িত্রী বৃদ্ধা দাই আমিনা ও আমার পৈত্রিক বাসভবনটী আপনার জিম্মায় রহিল। আপনি আমাকে ভুলিয়া থাকিবেন না। সর্ব্বদা পত্র ব্যবহার করিবেন। আমি কখন কোথায় থাকিব, তাহার ঠিকানাও আপনাকে জানাইব।"

মহাজন তখনই হৃষ্টচিত্তে আমাকে দুইসহস্র মুদ্রা নগদে গণিয়া দিলেন। আমার প্রয়োজনীয় চারিখানি জহরতও আমাকে ফিরাইয়া দিলেন। আমি তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া, সহরের মধ্যে ঋণ পরিশোধের চেষ্টায় গেলাম।

সহসা আমার এই ভাগ্য পরিবর্ত্তন ও ঋণ-পরিশোধের সক্ষম অবস্থা দেখিয়া, পাওনাদারগণ অতি বিস্মিত হইল। আমি তাহাদের পাওনাগুলি কড়ায়গণ্ডায় চুকাইয়া দিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

তার পর সময় বুঝিয়া, সেই দিনই দাইকে বলিলাম—"মা! তুমি অতি যত্নে, অতি স্নেহে, বাল্যকাল হইতে আমাকে মানুষ করিয়াছ। কখনও তোমার কাছ ছাড়া হই নাই! কিন্তু এভাবে চলিলে জীবিকার জন্য আমাকে পথে পথে ভিক্ষা করিতে হইবে। আমার এক পিতৃবন্ধু আমায় কিছু টাকা ধার দিয়াছেন। আমি সেই টাকা লইয়া কায়রোতে বাণিজ্যের জন্য যাইব। তুমি প্রসন্নমুখে অনুমতি দিলেই আমি চলিয়া যাই।"

দাই একথা শুনিয়া অনেক কাঁদিল কাটিল। কিন্তু কোনরূপ বাধা দিল না। কেননা সেই আমার প্রকৃত অবস্থা জানিত। আমি তাহাকে বলিলাম, তোমাকে আমি আমার পিতৃবন্ধু, প্রসিদ্ধ মণিব্যবসায়ী মহবুব্ সাহেবের হেপাজতে রাখিয়া গেলাম। আমার অবর্ত্তমানে তিনি তোমার ভার লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। বাড়ীঘরও তাঁর জিম্মায় রহিল।

দাই সাহসে বুক বাঁধিয়া প্রসন্ন মনে আমাকে বিদায় দিল। আমি মহবুবের নিকট বিদায় লইয়া, সেই রাত্রেই একদল স্বার্থবাহের সঙ্গে কায়রো অভিমুখে চলিয়া গেলাম। অতি দীর্ঘ দুর্গম মরুপথ, আমাদের অতিক্রম করিতে হইবে। অনেক নদ-নদী তড়াগ-প্রান্তর উত্তীর্ণ হইতে হইবে। এজন্য আমরা অতি সাবধানতার সহিত পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলাম।

পথে দস্যুভয় খুবই প্রবল। মহাজনেরা এজন্য দল বাঁধিয়া যাইতেন। তাহাদের সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরী থাকিত। তাঁহারা নিজেও অস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে জানিতেন। এজন্য দস্যুরা সহসা কোন বড় দলের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইত না।

(৭)

আমাদের দল প্রথমে মৌসলনগরের পথ ধরিল। তারপর দামাস্কসে আসিয়া, তাহারা মৌসলে সংগৃহীত পণ্যাদি বিক্রয় করিল।

ইহার পর সুদূরব্যাপী মরুভূমি। আমরা আরবের মরুক্ষেত্রের মত

এক বিশাল মরু পার হইয়া, ফারাণ পর্ব্বতের তলদেশ দিয়া ইতিহাসবিশ্রুত কায়রো নগরীতে উপস্থিত হইলাম।'

এমন সুন্দর সহর আর কখনও আমি দেখি নাই। বোগদাদ, বসোরা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু কায়রোর কাছে কোথায় লাগে বোগদাদ আর বসোরা।

চারিদিকে গগনস্পর্শী উন্নত সৌধাবলী। ইহাদের অধিকাংশই সমুচ্চ মিনার শোভিত। সুউচ্চ মিনারগুলি গগনতল স্পর্শ করিয়াছে। সূর্য্যকিরণে তাহাদের শুভ্র চূড়াগুলি ঝক্‌মক্ করিতেছে। এই সকল প্রাসাদের আশেপাশে বিচিত্র শোভনোদ্যান। মস্‌জেদের সংখ্যা খুবই বেশী। কোনটী বা সাদা পাথরে কোনটী বা লাল পাথরে গাঁথা। সমস্ত পথই প্রশস্ত ও প্রস্তর নির্ম্মিত। পথের দুই পার্শ্বেই ছোট বড় অট্টালিকা শ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর মুসাফেরখানা। আর সহরের দুই তিন স্থানে বিচিত্র শোভনোদ্যান থাকায়, তাহার শোভা যেন আরও নেত্র-তৃপ্তিকর হইয়াছে।

আমার পিতৃবন্ধু আমাকে যে সরাইখানায় আশ্রয় লইতে উপদেশ দিয়াছিলেন—আমি সেই সরাইখানাতেই গেলাম। সরাইরক্ষক একজন সঙ্গতিপন্ন লোক। তিন পুরুষ ধরিয়া সে এই কাজ করিয়া আসিতেছে। এই কাজে তাহারা অনেক পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছিল। আমার পিতার নাম করিবামাত্র, সে আমায় বড়ই সম্মান করিল। লোকটী অতি সদাশয়।

সরাইখানার মধ্যে যে কক্ষটী আলোক ও বায়ুপ্রবাহ পূর্ণ, সেইটীই আমি নিজের ব্যবহারের জন্য বাছিয়া লইলাম। কাহারও সহিত অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করা, আমার অভিপ্রায় নহে। এজন্য খুব কমই সেই সরাইখানার লোকেদের সঙ্গে মিশিতাম। আমার স্বর্গীয় পিতা, এই বিশ্ববিশ্রুত কায়রো নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই খানেই তাঁহার ভাগ্য গঠন হয়। এই সহরে আমারও জন্ম হইয়াছিল। কাজেই এই পিতৃভূমি আর আমার জন্মস্থান কায়রো, আমার চক্ষে অতি পবিত্র বলিয়া বোধ হইল।

যে কায়রোতে আমার পিতা একদিন ওমরাহের মত দর্পিতভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন, আজ তাঁহার একমাত্র পুত্র হইয়া, আমি কিনা অতি সামান্য ব্যবসায়ীর মত সেই সহরে আসিয়াছি, এই চিন্তা আমার চিত্তক্ষেত্রকে এক এক সময়ে বড়ই আলোড়িত করিত। আমি শান্তি পাইবার আশায়, নীলনদীর তীরে প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বেড়াইতে যাইতাম।

নীল নদীর পার্শ্বেই কায়রোর অধিপতি সুলতানের গগনস্পর্শী প্রাসাদ। এক দিন এই প্রাসাদ প্রাচীরের পার্শ্ব দিয়া আসিতেছি, এমন সময় আমার দৃষ্টি, সহসা সেই প্রাসাদের এক গবাক্ষের উপর পড়িল।

দেখিলাম, এক পরমাসুন্দরী নারীমূর্ত্তি হারেমের উন্মুক্ত বাতায়নমুখে দাঁড়াইয়া আছে। কে যেন চঞ্চলা চপলাকে সেইস্থানে শক্তির অধীন করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

সেই রূপসীকে দেখিবামাত্রই আমার কি যেন একটা মোহ উপস্থিত হইল। আর কখনও আমি এমন পরমা সুন্দরী রমণী দেখি নাই। প্রস্তর প্রাচীরের উপরেই সেই বাতায়ন। আমি প্রাচীরের নীচে দাঁড়াইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত ধরিয়া প্রাণের আশা মিটাইয়া সেই অনিন্দ্য রূপরাশি দেখিলাম। আর ক্রীতদাসের মত সেই সুন্দরীর চরণে আত্ম বিক্রয় করিলাম।

আমার সহিত দৃষ্টি সম্মিলন হইবামাত্রই, সেই রূপসীশ্রেষ্ঠা যেন ঘৃণাপূর্ণ বিরক্তির সহিত, ত্বরিতগতিতে সেই গবাক্ষপথ হইতে সরিয়া গেল। আমি তাহার পুনর্দ্দশনাশায় কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু কোন ফলই হইল না। একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, আমি সেই পাষাণকায় প্রাচীর পার্শ্ব হইতে চলিয়া আসিলাম।

বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াও, আমি সেই রূপসীর চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিলাম না। মনে ভাবিলাম—আশা মিটাইয়া ত এই রূপ দেখা হইল না। আর কখনও কি এমন সুযোগ ঘটিবে যে, তাহাকে আবার দেখিব! হায়! কেন সে অত রূপসম্পদ লইয়া এ ধরায় আসিয়াছিল?

কে সে—তাও জানি না। খুব সম্ভবতঃ হয়তো সুলতানের কোন রূপসী অন্তঃপুরিকা। এক নিমেষের দর্শনে—সে আমার প্রাণ চুরি করিয়াছে। আমার জাগা ঘরে সিঁধ দিয়াছে।

চক্ষু চাহিলে দেখি—সে। চোখ্ বুজিলে দেখি, অন্তর আলো করিয়া আছে—সে। নিদ্রায়—সে, জাগরণে—সে। হায়! কেন আমার এ দশা হইল?

প্রবৃত্তি দমনেই পুণ্য। একবার এই প্রবৃত্তির ছলনায় আমি যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়াছি। সুতরাং এই প্রবৃত্তিকে আয়ত্তাধীনে রাখিবার জন্য, আমি খুবই চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু প্রবৃত্তির শক্তিই প্রচুর বল সঞ্চয় করিল। নিবৃত্তি হারিয়া গেল।

স্বপ্নে একদিন সেই লোকললামভূত সুন্দরীশ্রেষ্ঠার মূর্ত্তি দেখিয়া আমার সুপ্ত প্রবৃত্তি আবার শক্তিসঞ্চয় করিল। স্বপ্নে দেখিলাম—সে যেন আমার শয্যাপার্শ্বে দাড়াইয়া বলিতেছে—"হায়! তোমার প্রাণ অতি পাষাণ! তাহাতে কি তিলমাত্র স্নেহ নাই, মায়া নাই, প্রেম নাই! যদি আমায় এ ভাবে মজাইবে, ত দেখা দিলে কেন? দেখা দিয়া যদি মজাইয়া গেলে ত আর আসিলে না কেন?"

জাগরণেও এই স্বপ্নের কথা ভুলিতে পারিলাম না। প্রবৃত্তির এবার জয় হইল। আমি তিন দিন পরেই আবার অসহিষ্ণুচিত্তে সেই প্রাচীরপার্শ্বে গিয়া দাড়াইলাম। কিন্তু বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও সেই সুন্দরী শ্রেষ্ঠাকে দেখিতে পাইলাম না।

তাহার রূপচ্ছবি আমার মনের ভিতরে বড়ই গভীরভাবে দাগ কাটিয়াছিল। সেই সুন্দর মুখখানি ভুলিতে পারা আমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব! মনে ভাবিলাম,—কেন আমার এ উন্মত্ততা ঘটিল? কেন

আমি এক অপূর্ব্বপরিদৃষ্টার, অপরিচিতার রূপ দেখিয়া মজিলাম। যাহাকে পাইবার সম্ভাবনা নাই, যাহাকে চিনি না, যে সুলতানের শুদ্ধান্তঃপুরবাসিনী, তাহাকে দেখিয়া আমার এ অবস্থা কেন?

রূপ ও রূপের মোহ, মানুষকে জাহান্নমে পাঠায়। ইতিপূর্ব্বে রূপের উন্মত্ততাই আমাকে জাহান্নমে দিয়াছিল। অনেক কষ্টে আমি আবার পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি। আবার সেই রূপ আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছে। এই ব্যাপারে বুঝিলাম, আমার ভোগের যে টুকু বাকি আছে, তাহা এই "রূপ" হইতেই হইবে।

চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ভুলিতে পারিলাম না। মনে ভাবিলাম, আর কিছু না হোক, তাহাকে আর একবার দেখিব। আমার অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, আমার এ দর্শনাশা যে উপায়ে হোক চরিতার্থ করিব।

আবার সেখানে গেলাম। আবার সেই রূপ তৃষিত আশাপ্রতীক্ষা। কিন্তু নিরাশার উষ্ণ নিশ্বাসে জ্বলিয়া মরিলাম। সেই গবাক্ষ-পথে আমার হৃদয়মনমোহিনী সে দিন আর আসিল না। আমি নিরাশচিত্তে নিজাবাসে ফিরিয়া আসিলাম।

আবার অশান্ত হৃদয়ে, তৎপর দিন রাত্রে সেই প্রাসাদ প্রাচীরপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম। পরম সৌভাগ্য আমার, সেই ভুবনমোহিনী সে দিন গবাক্ষ পথে দেখা দিল।

আবার দেখিলাম। আবার মজিলাম। আবার সে রূপের ছবি

উজ্জ্বল বর্ণে মনোমধ্যে চিত্র করিয়া লইলাম। মনে ভাবিলাম, যতক্ষণ এই ভাবে দর্শনের সুখভোগ হয়, ততক্ষণই এ প্রাণ স্বর্গের-সুখ অনুভব করিবে। কিন্তু সেই সুন্দরী, এইরূপ নির্লজ্জভাবে একদৃষ্টে তাহার দিকে আমায় চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল,—"দুঃসাহসী—ধৃষ্ট যুবক! তোমার প্রাণে কি একটুও ভয় নাই? জাননা কি তুমি, সুলতানের অন্তঃপুর এই প্রাচীরে পার্শ্বে। এখানে কাহারও দাঁড়াইবার হুকুম নাই। যদি সুলতানের প্রহরীরা তোমায় দেখিতে পায় ত এখনি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিবে।"

কি নিষ্ঠুরতা! কি হৃদয়হীনতা! আমি অম্লান বদনে সেই বরবর্ণিনীর এই তিরস্কার সহ্য করিলাম। অবনত মস্তকে তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া কাতর ভাবে বলিলাম,—"সুন্দরী! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিও। দোষ আমার নহে। দোষ তোমার। আমি এই সহরে একজন নূতন আগন্তুক! অবশ্য এ দেশের আইন-কানুন আমার অপরিজ্ঞাত। আর তাহা জানিলেও আমি বোধ হয়, আমার এ সঙ্কল্প হইতে বিরত হইতাম না। কেননা তোমার অই ভুবনমোহন রূপ আমায় উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে।"

সেই সুন্দরী বিরক্তিপূর্ণ মুখে আমায় বলিল,—"সদ্বংশজাত ব্যক্তির শীলতাই একটা মহৎ গুণ। দেখিতেছি, তোমার তাহা নাই। প্রাণের ভয়ও মানুষের থাকে, তোমার তাহাও নাই। তুমি ঘোর উন্মাদ! যদি সহজে এখান হইতে না চলিয়া যাও, আমি এখনি খোজাদের ডাকিব। বুঝিও—তাহাতে তোমার জীবন বিপন্ন হইবে।"

এই কথা বলিয়া, সেই মদগর্ব্বিতা সুন্দরী, মরালীর ন্যায় গ্রীবা বক্র করিয়া, আমার দিকে একটী ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া, বাতায়ন পথ পরিত্যাগ করিল।

আমি ভাবিলাম, হয় তো সে আমার এই ধৃষ্টতার শাস্তি দিবার জন্য সত্যসত্যই প্রহরীদের ডাকিতে গিয়াছে। সুতরাং এখানে বেশীক্ষণ থাকা কোন ক্রমেই নিরাপদ নহে। এই ভাবিয়া, অতি ক্ষুণ্ণ মনে আমি সেই স্থান ত্যাগ করিলাম। তাহার কথাগুলি তীব্র তিরস্কার মাখা হইলেও, তাহাতে যেন একটা উন্মাদকর মধুরতা ছিল। সেই সুন্দর চক্ষুর চকিত-চঞ্চল-দৃষ্টি ঘৃণাব্যঞ্জক হইলেও তাহা যেন করুণায় ভরা। তাহার সেই রোষদৃপ্ত মূর্ত্তিখানির, আর সেই গর্ব্বভরা মাধুরীর প্রতিচ্ছায়া, আমার চোখের সম্মুখে সর্ব্বদাই বিরাজ করিতে লাগিল।

অনিদ্রায়, উদ্বেগে, দুঃস্বপ্নে, দুশ্চিন্তায় রজনী প্রভাত হইল। আমি মনে ভাবিলাম, "অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক, বার বার তিন বার চেষ্টা করিয়া দেখিতেই হইবে। হয় তো সে আমায় বৃথা ভয় দেখাইয়াছে। হয় তো সে মনে মনে আমায় ভাল বাসিয়াছে। সে তো বিনা বাক্যব্যয়ে গবাক্ষ পথ হইতে সরিয়া যাইতে পারিত। আমার অজ্ঞাতসারে অতি গোপনে প্রহরীদের ডাকিয়া দিতে পারিত। কিন্তু তাহা যখন করে নাই, বরঞ্চ আমার উপরে প্রকারান্তরে শিষ্টতা দেখাইয়াছে, তখন শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া আমি কোন ক্রমেই নিরস্ত হইব না। ইহাতে আমার অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক।

প্রভাত গেল, মধ্যাহ্ন দেখা দিল। মধ্যাহ্ন চলিয়া গেল। অপরাহ্ণ আসিল। উৎকণ্ঠিত চিত্তে আমি প্রেমিক প্রেমিকার মিলন-দূতী সন্ধ্যার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

আরামদায়িনী সন্ধ্যা, তারার হার কবরীতে পরিয়া, কৃষ্ণ বসনে শরীর ঢাকিয়া, ধরার বুকে দেখা দিলেন। যাথসময়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে, আত্মগোপন করিয়া, আবার সেই প্রাচীরপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম। উজ্জল আলোকে, অন্তঃপুরের সেই কক্ষটি আলোকিত। কিয়ৎক্ষণ সেই শূন্য কক্ষের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। মনে ভাবিলাম, তাহা হইলে আজ কি আর দেখা হইবে না? পরক্ষণে সেই অপ্সরীমূর্ত্তি, বাতায়ন-পথে আসিয়া দাঁড়াইল। আমাকে দেখিবা মাত্র সে যেন ক্রোধে জলিয়া উঠিল। অতি রুষ্ট স্বরে বলিল,—"আমার কথায় তোমার এখনও চৈতন্য হইল না? তুমি আবার আসিয়াছ! বার বার—তিন বার। আমি দুই বার তোমায় মার্জ্জনা করিয়াছি। এবারও করিলাম। যাও, এখনি চলিয়া যাও, তাহা না হইলে, আমিই তোমার অতি শোচনীয় মৃত্যু ঘটাইব!"

এই কথা শুনিয়া আমি বড়ই মনোকষ্ট বোধ করিলাম। পুষ্প-কোমলা, করুণা-ভরা নারী কি এতটা পাষাণী হইতে পারে? তাহাকে বলিলাম,—"এ প্রাণ যখন তোমার ঐ কিংশুককোমল-চরণে সমর্পণ করিয়াছি, যখন তোমাকে আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়া ভাল বাসিয়াছি, তখন এ প্রাণের উপর তোমারই ষোল আনা অধিকার। যাহাতে তোমার তৃপ্তি হয়, তাহাই হউক।" তোমার ঐ কমললাঞ্ছিত গণ্ডরাগ, আরক্ত ওষ্ঠাধর,

কৃষ্ণতারকাময় নেত্র দুটী, আমাকে জ্ঞানহীন করিয়া তুলিয়াছে। তোমার অনুরাগ পাইব না। তাহার আশাও করি না। কিন্তু তোমার চিত্তের সন্তোষ সাধন যাহাতে একটুও করিতে পারি, তাহাই আমার প্রাণের কথা। যদি এ হৃদয়ের রুধির আকর্ষণ করিয়াও তোমার মনে একটা তৃপ্তি আসে, আনন্দ আসে, তাহা করিতেও আমি প্রস্তুত। নিষ্ঠুর খোজাদের শাণিত অস্ত্রাঘাতনিঃসৃত দ্বিধাবিভক্ত এই হৃদয়ের শোণিত ধারা যদি তোমার সহানুভূতির একটাও দীর্ঘ নিশ্বাসও আকর্ষণ করিতে পারে, তাহা হইলেও আমি কৃতার্থ বোধ করিব।"

আমার এই সমস্ত মর্ম্মস্পর্শী কথায়, সেই পাষাণীর প্রাণে বোধ হয় করুণা হইল। সে বলিল,—"ভাল! যদি তুমি আমার সাহচর্য্য লাভের জন্য এতই ব্যাকুল হইয়া থাক, প্রাণের মায়া ত্যাগ করিতেও যখন তুমি প্রস্তুত, তাহা হইলে আজ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় এই প্রাচীর নিকটে আসিও। যতক্ষণ না আমি কোন সংবাদ পাঠাই, ততক্ষণ প্রাচীর তলে অপেক্ষা করিও।"

আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, ধরণীকে অতি সুখময় বোধ করিলাম। পার্শ্বে উজ্জ্বল লহরমালা পরিশোভিত, নীলনদ কলনাদে অনন্তের পথে উধাও হইয়া চলিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, সুতরাং অন্ধকার ক্রমশঃ জমাটভাব ধারণ করিতেছে। নিশীথিনীর ক্রমবিকাশের সহিত, গভীর রাত্রে ধরা চন্দ্রালোকে উজ্জ্বলিত হইবে। আর এই চন্দ্রালোকিত নিশীথ কালে, আমি প্রিয়তমার সহিত মিলিত হইব।

তখন রজনীর প্রথম প্রহর। ত্রস্তপদে নিজ নিবাসে ফিরিয়া আসিলাম। আহারাদি শেষ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কি রূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, প্রিয়তমার নিকট যাওয়া উচিত। নিজের মুখে বলা অনুচিত। আত্মপ্রশংসা অতি নিন্দনীয়। কিন্তু তাহা হইলেও বলিব। আমার যৌবন আর রূপ ছিল। আর সে রূপের একটা আকর্ষণী শক্তিও ছিল। আমি চিত্তরঞ্জিনী প্রসাধনপ্রক্রিয়া দ্বারা, সেই সুন্দর-কান্তিকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিলাম। আমার পরিধেয় সমূহের মধ্যে যেটী বহুমূল্য, সেইটীই পরিলাম। ইস্তাম্বুলবাসিত পরিচ্ছদ, সেই কক্ষ মধ্যে যেন নন্দনের সুবাস ছুটাইয়া দিল। তখনও পিতৃ-প্রদত্ত দুইটী বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয় আমার অধিকারে ছিল। সেই দুইটী অঙ্গুরীয়ও আমার অঙ্গুলির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সহায়তা করিল।

রজনীর মধ্য যাম যেন আর আসিতে চাহে না। কিন্তু সময় কাহারও জন্য ত অপেক্ষা করে না। তাহাকেও আসিতে হইল। নিশাসুন্দরীর গভীর নিস্তব্ধতা দেখিয়া বুঝিলাম, দ্বিপ্রহর সমাগত প্রায়।

আমি যে বাটীতে থাকিতাম, তাহার একটী গুপ্তদ্বার ছিল। সদর দরোজা দিয়া বাটির বাহির হইলে, যদি কাহারও নজরে পড়ি, এই ভাবিয়া এই গুপ্ত দ্বার দিয়াই সরাইখানা হইতে বাহির হইলাম।

তখন বিরল জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। অন্ধকার ক্ষীণশক্তি হইতেছে। শুভ্র চন্দ্রকরলেখা, নীল নদের সুনীল তরঙ্গের সহিত মিশিয়া গিয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের বিকাশ করিয়াছে। নদীগর্ভস্থিত শৈবালময় কৃষ্ণকায় শিলা-

খণ্ডের গাত্রে ফেনমাখা তরঙ্গগুলি মহাশব্দে প্রহত হইতেছে। সেই গভীর রজনীতে এই চিত্তমোহকর বিচিত্র নৈশশোভার কমনীয়তা দেখিয়া, আমার উৎকণ্ঠাকাতর প্রাণ, অনেকটা শান্তভাব ধারণ করিল।

আমি উৎকণ্ঠিত চিত্তে, যথাস্থানে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমার হৃদয়ানন্দ-দায়িনী সেখানে উপস্থিত নাই বটে, কিন্তু যাহাতে আমি তাহার কাছে যাইতে পারি, সে উপায় সে করিয়া দিয়া গিয়াছে। সবিস্ময়ে দেখিলাম, একটী সুদৃঢ় রজ্জু-নির্ম্মিত সোপান সেই গবাক্ষ গাত্র হইতে প্রাচীরের গায়ে ঝোলান রহিয়াছে। প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। তারপর ভয় দেখা দিল। কারণ যেখানে যাইতেছি, সেটা যে সুলতানের হারেম। ধরা পড়িলে, আমার যে ভয়ানক বিপদ ঘটিতে পারে তাহাও বুঝিলাম। কিন্তু তখন সেই সুন্দরীর মিলনাশায় আমার চিত্ত এতটা বিভোর, আমি এতটা দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য, যে এসব ভাবী বিপদের ভাবনাও আমার মনে একটুও আশঙ্কার উদ্রেক করিয়া দিল না। সেই রজ্জু সোপানাবলম্বনে, আমি গবাক্ষতলে উপস্থিত হইয়া, অতি সন্তর্পণে কক্ষের ভিতরে গিয়া পড়িলাম।

সেখানে জনপ্রাণীও নাই। কেহই আমার সম্বর্দ্ধনার জন্য বা আমাকে পথ দেখাইয়া দিতে কক্ষমধ্যে আসিল না। দেখিলাম, অদূরবর্ত্তী আর একটী কক্ষে আলো জ্বলিতেছে। আমি অতি ধীরগতিতে, সেই উজ্জ্বলিত কক্ষ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক। দেখিলাম সেই কক্ষ অসংখ্য উজ্জ্বল আলোকে পরিপূর্ণ। সজ্জ-

বিকশিত কুসুমবাসের সহিত—গোলাপের অমিয়গন্ধ মিশিয়া, সেই কক্ষ মধ্যে স্বর্গের সৌরভ ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কক্ষের সজ্জাও সেইরূপ। অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে, যেখানে আমার প্রিয়তমা এক মখমল মণ্ডিত রৌপ্য সিংহাসনের উপর বসিয়া ছিলেন তথায় উপস্থিত হইলাম। সেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠাকে একটী কুর্ণীস করিয়া বলিলাম—"আমি বড়ই সৌভাগ্যবান, যে আজ তোমায় এভাবে দেখিতে পাইলাম। আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর সাহেবা!"

সেই বরবর্ণিনী মৃদুহাস্যের সহিত বলিল—"বোধ হয় রজ্জুসোপানে উপরে উঠিতে তোমার অনেক কষ্ট হইয়াছে। এজন্য আমি বড়ই দুঃখিত। কিন্তু এই উপায় ভিন্ন তোমাকে হারেমের মধ্যে আনাইবার আর কোন পথই নাই।"

আমি সহাস্যমুখে বলিলাম—"না কোন কষ্টই আমার হয় নাই সুন্দরী! তোমার দর্শন মাত্রেই আমি সকল কষ্ট ভুলিয়াছি। অয়ি ভুবনমোহিনী! দাও তোমার ঐ কোমল হস্তখানি আমায় একবার চুম্বন করিতে। আমি ধন্য হই।"

সহাস্যমুখে সেই সুন্দরী শ্রেষ্ঠা বলিলেন—"একবারে এতটা অগ্রসর হওয়া ঠিক নয় সাহেব!" এই কথা বলিয়া সে তাঁহার সুন্দর হাতখানি আমার সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিল। আমি তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া, সেই পেলব করপল্লব চুম্বনরেখান্বিত করিয়া, একটা অপার্থিব আনন্দ বোধ করিলাম। সেই বরাঙ্গিনী আমার ব্যবহারে যথেষ্ট প্রীতিলাভ

করিল। সে আমায় হাত ধরিয়া তাঁহার পার্শ্বের আর একখানি রৌপ্য খচিত আসনে আমাকে বসাইল। কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, সে হাস্যমুখে বলিল—"যুবক! আমি ইতিপূর্ব্বে তোমার সহিত যথেষ্ট কঠোর ব্যবহার করিয়াছি, আর সেরূপ করিবার কারণও ছিল। এজন্য তুমি আমায় মার্জ্জনা কর। কায়রোর প্রবল পরাক্রান্ত সুলতান জিয়াকর হোসেনের প্রাসাদে, মক্ষিকারও প্রবেশ নিষেধ। এটা তার অন্দর-মহল। এই অন্দর প্রাচীরের নিম্নে, চারিদিকে কঠোর পাহারার বন্দোবস্ত। পাছে নিষ্ঠুর কাফ্রি-প্রহরীর হস্তে পড়িয়া, তোমার প্রাণ যায়, ইহা ভাবিয়াই আমি তোমায় ওরূপভাবে তিরস্কার করিয়াছিলাম। নিষ্ঠুরার মত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম। এজন্য আমার বেয়াদবি মার্জ্জনা কর সাহেব! যখন দেখিলাম, আমার জন্য তুমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত, তখন তোমার উপর আমার বড়ই একটা সহানুভূতি জাগিয়া উঠিল। সেই সহানুভুতির ফলে আজ তুমি এখানে আসিতে পারিয়াছ।"

আমি আগ্রহভরে তাঁহার বস্ত্র প্রান্ত চুম্বন করিয়া বলিলাম—"আমি ইতিপূর্ব্বে তোমাকে পাষাণহৃদয়া বলিয়া যে সন্দেহ করিয়াছিলাম, তজ্জন্য আমায় মার্জ্জনা কর সুন্দরী!"

সেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলিল—"তোমার রূপ দেখিয়া আমার প্রাণেও যে একটু দাগ পড়ে নাই, তাহা মনে করিও না। আমি যে মহলে থাকি সেখানে স্বয়ং সুলতান ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের প্রবেশ অধিকার নাই। আসিলেই খোজারা তাহাকে হত্যা করিবে। তোমার উপর আমার একটা

আকর্ষণ না জন্মিলে, আমি কখনই তোমাকে এভাবে প্রশ্রয় দিতাম না। এত বিপদের মুখ দিয়া তোমায় এখানে আনিতাম না। সুলতান আজ আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন—দৈহিক অসুস্থতার জন্য, তিনি রাত্রে আমার মহলে আসিতে পারিবেন না। সেইজন্যই তোমাকে এখানে আনিবার অবসর পাইয়াছি। তোমার সুন্দর কান্তি ও কথাবার্ত্তার ভঙ্গি দেখিয়া বুঝিতেছি, তুমি কোন সম্ভ্রান্তবংশ সম্ভূত। সত্যই তুমি কি এই সহরের অধিবাসী নও ?”

আমি বলিলাম—“না। বসোরায় আমার নিবাস। ঘটনাচক্র-নিপীড়নে, আজ এই বিদেশে, ভাগ্য পরীক্ষার জন্য আসিয়াছি।”

সেই যুবতী মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—“তোমার জীবনের কাহিনী আমার কাছে বলিতে কোন আপত্তি আছে কি ?”

“কিছুই না—”এই বলিয়া আমার বিড়ম্বিত জীবনের অতীত ঘটনা-গুলি আমি তাহাকে স্বল্প সময়ের মধ্যেই গুছাইয়া বলিলাম।

আমার উপর, তখন তাহার খুব একটা সহানুভূতি দেখা দিল। সে বলিল—“তুমি না চাহিলেও আমি আমার পরিচয় দিব। আমার নাম, লতিফা। আমি এ দেশের, এ রাজ্যের অধিবাসী নহি। দামস্কসে আমার জন্ম। আমি সুলতানের বেগমও নহি, আশ্রিতা বিলাসিনীও নহি। এখনও পর্য্যন্ত আমি অনাঘ্রাত কুসুমবৎ পবিত্র। কিন্তু বেশী দিন যে এ অবস্থায় থাকিতে পারিব, আমার নারীসম্মান অক্ষত রাখিতে পারিব, এরূপ ত বোধ হয় না।”

আমি বলিলাম—"কেন? ইহার কারণ কি?"

যুবতী বলিল—"তাহা হইলে আমার জীবনের কথাগুলি তোমায় খুলিয়া বলা প্রয়োজন। তোমার জীবনের কাহিনীর মত, তাহাও এক শোচনীয়বিপ্লবময় ঘটনা পরিপূর্ণ।"

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, সেই সুন্দরী বলিল—"দামাস্কসের এখন যিনি সুলতান, আমার পিতা তাঁহার প্রধান উজীর ছিলেন। সুলতান আমার পিতাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। বাল্যকাল হইতেই উভয়ের মধ্যে একটা প্রীতির বাঁধন পড়ে। আমার পিতা রাজ্যের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশে, সুলতান তাঁহাকে নিজের প্রধান উজীর করিয়া দেন।

দেশাধিপতি, সকল বিষয়েই, আমার পিতার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কিছু করিতেন না। নিম্নস্তর হইতে উজীরের পদে উন্নীত হওয়ায় তাঁহার খুব শীঘ্রই ভাগ্যোন্নতি হইল। বৎসর কয়েক মধ্যে, দামাস্কসের মধ্যে তিনি একজন গণনীয় ধনী হইয়া উঠিলেন।

এই সব ব্যাপারে, অনেকেই তাঁহার শত্রু হইল। তাহারা এক চক্রান্ত-জাল সৃষ্টি করিয়া, পিতার অধঃপতনের চেষ্টা করিতে লাগিল। যাহাতে সুলতানের সহিত আমার পিতার মনোবাদ বৃদ্ধি হয়, এ সম্বন্ধে তাহারা স্বতঃপরত চেষ্টাচরিত্র করিতে লাগিল। যেমন দুষ্টের চেষ্টা কখনও নিষ্ফল হয় না তেমনি সৌভাগ্যও লোকের চিরদিন থাকে না। আমার পিতার বিরুদ্ধে ক্রমাগতঃ লাগাইয়া, তাহারা সুলতানের কাণ ভারি করিয়া

তুলিল। পিতা যখন বুঝিলেন, এই সমস্ত গুপ্তশত্রুদের হাত হইতে মুক্তির আর কোন উপায় নাই, তখন তিনি উপায়ান্তরবিহীন হইয়া পদত্যাগ করিলেন।

ভাগ্যের পতনের সঙ্গে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গেল। দারুণ দুশ্চিন্তার ফলে ভীষণ ক্ষয় রোগ দেখা দিল। পিতা সেই রোগেই নশ্বর দেহত্যাগ করিলেন।

আমার এক দুষ্টবুদ্ধি খুল্লতাত—পিতার প্রধান গুপ্তশত্রু ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে আনুগত্য দেখাইতেন—কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার পিতার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর এই খুল্লতাত, আমাদের সহিত আরও আনুগত্য করিতে লাগিলেন। আমার বয়স তখন বার বৎসর। পিতৃব্যের এ আনুগত্যকে আমি সন্দেহের চক্ষে দেখিলাম। কিন্তু আমার পিতা এই ক্রূরমনা খুল্লতাতকে খুব ভালরূপেই জানিতেন। এজন্য বহুকাল তিনি তাহাকে আমাদের বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। এখন তিনি সেই সব অপমানের প্রতিশোধ চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। আমার মাতাকেও তিনি খুল্লতাত সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তখন আমাদের রক্তসম্পর্কীয় কোন অভিভাবকই ছিল না। এজন্য বাধ্য হইয়া, মা ও আমি পিতৃব্যের মন যোগাইতে লাগিলাম।

আমার মাতাকে পরামর্শ দিয়া পিতৃব্য আমাদের সুবৃহৎ প্রাসাদতুল্য আবাসবাটিটী বিক্রয় করাইলেন। বহুমূল্য হীরা জহরৎ যাহা কিছু ছিল, সবই বিক্রয় করাইয়া নগদ টাকায় পরিবর্ত্তিত করান হইল।

আমরা তখন সহর ত্যাগ করিয়া, উপকণ্ঠের এক ক্ষুদ্র বাটীতে সামান্য গৃহস্থের মত দিন কাটাইতে লাগিলাম। বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থই মাতার নিকট ছিল। খুল্লতাত বহুবার তাহা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সফলকাম হন নাই।

একদিন আমার মাতা সহসা পীড়িত হইলেন। ক্রমাগতঃ ভেদ ও বমন। সেই পীড়াতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। আমি একবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলাম। কিন্তু আমার মনের বিশ্বাস, আমার মাতার এই সাংঘাতিক পীড়া স্বভাবজাত নহে। খুল্লতাত মাতার খাদ্যের সহিত গোপনে বিষ মিশাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতেই এই পীড়া উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার প্রমাণও আমি পাইয়াছিলাম।

আমার মাতার গুপ্তধন সমূহ নির্ব্বিবাদে সংগ্রহ করিবার জন্যই, যে স্বার্থপর খুল্লতাত নারী হত্যা করিল, ইহা জানিতে পারিয়া আমার মন বড়ই দমিয়া গেল। মনে ভাবিলাম—আজ যে ভাবে আমার মাতার মৃত্যু ঘটিল, কাল হয়তো সেই ভাবেই আমার অপমৃত্যু ঘটিতে পারে। আমি খুব সাবধানে অতি শঙ্কিতচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলাম। মনে ভাবিলাম, এই সহরের কাজি এখন যিনি, তিনি আমার পিতৃবন্ধু। এই কাজীকে গিয়া সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিলে, তিনি হয়তো আমাকে আইনবলে এই নরাধম খুল্লতাতের কবল হইতে বা তাঁহার পদোচিত ক্ষমতার সহায়তায় চিরমুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু আমার খুল্লতাত শয়তানীতে অগ্রগণ্য। সে আমার এ সংকল্পও বিফল করিয়া দিল।

পাছে আমি কোন দিন গোপনে বাড়ী ছাড়িয়া, অন্য কোথাও চলিয়া যাই, এজন্য সে আমার উপর কঠোর পাহারা রাখিল। একজন কাফ্রি রমণী, আমার রক্ষিকারূপে সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিত। এক দণ্ডের জন্য একা থাকিতে দিত না।

মাতার মৃত্যুর পর, এইভাবে অত্যাচার ও পীড়নের মধ্য দিয়া দেখিতে দেখিতে তিন চারি বৎসর কাটিয়া গেল। যৌবনের বিকাশের সঙ্গে আমার সৌন্দর্য্য প্রভার সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। অনেক পদস্থ লোক, আমাকে বিবাহ করিবার জন্য খুল্লতাতের নিকট প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমার খুল্লতাত তাহাদের কথা কাণেই তুলিলেন না। তাঁহার মনের উদ্দেশ্য যে কি, তাহাও ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

উজীরের কন্যা আমি। উচ্চ কুলোদ্ভবা কুলকামিনী আমি। রূপসী আমি। সুশিক্ষিতা আমি। তবে আমার এ অবস্থা কেন? পিতার যা কিছু সম্পত্তি ছিল, সবই এই শয়তান খুল্লতাত আত্মসাৎ করিয়াছে। আমার মাতাকে সে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়াছে। যে সমস্ত সদ্বংশজাত ভদ্রসন্তান আমার পাণিপ্রার্থী হইয়া আসিতেছিল, তাহাদেরও সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাহার মনের উদ্দেশ্য যে কি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমি বড়ই দিশাহারা হইলাম।

এক দিন কথায় কথায়, আমার সেই কাফ্রি দাই, ভিতরের সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করিয়া দিল। সে আমাকে হাস্য মুখে বলিল,—"লতিফা! তোমার কাল যে বিয়ে।"

আমি এ কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। এই দাইটা পিতৃব্যের অর্থে ক্রীত হইলেও, ক্রমাগতঃ সাহচর্য্য নিবন্ধনই হৌক বা যে কারণেই হৌক, আমার উপর তাহার একটা স্নেহ জন্মিতেছিল। সে বাহিরে কঠোর ভাব দেখাইলেও, আমাকে মনে মনে যে স্নেহ করিত তাহাও আমি জানিতাম।

আমি বলিলাম,—"দাই! তুমি আমাকে মেয়ের মত দেখ। এই কি তোমার ঠাট্টার সময়?"

দাই। না মা! আমি সত্য কথা বলিতেছি।

আমি। কি করিয়া তুমি জানিলে, যে কাল আমার বিবাহ হইবে?

দাই। তোমার খুল্লতাত, আর একটা দুষমন চেহারার লোক, দুজনে বসিয়া কি একটা পরামর্শ আঁটিতেছিল। তাহাদের সেই কথার মধ্যে তোমার ও আমার নামোল্লেখ শুনিয়া, আমি অন্তরালে লুকাইয়া তাহাদের সব কথা শুনিয়া আসিয়াছি।

আমি। যে লোকটা কাকার কাছে আসিয়াছিল, সেই আমায় বিবাহ করিবে নাকি?

দাই হাঁ নিশ্চয়ই। তাকে আমি চিনি। সে দামস্কাসের একজন ধনী মহাজন। কিন্তু অতি শয়তান ও চরিত্র হীন। শুনিয়াছি, সে দুই দুই বার পত্নী হত্যা করিয়াছিল। পঞ্চাশ হাজার সেকুইন সে তোমার খুল্লতাতকে দিবে।

আমি এই কথা শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। বাল্যকালে

আমাদের বাড়ীতেই এই শয়তানকে আমার পিতার কাছে দুই একবার আসা যাওয়া করিতে দেখিয়াছিলাম। বুঝিলাম, অর্থহীন, মধ্যবিত্ত ভদ্র সন্তানদের উপেক্ষা করিয়া, আমার গুণধর খুল্লতাত পঞ্চাশ হাজার মুদ্রার লোভে, এই দুর্দ্দান্ত শয়তানের হস্তে, আমাকে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

কথাটা শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সর্ব্বশরীর ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। পিতার আদরিণী কন্যা আমি। আমার যে এই শোচনায় পরিণাম হইল, ইহা ভাবিয়া আমি একবারে বুকভাঙ্গা হইয়া পড়িলাম।

আমি সভয়ে উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিলাম,—"সত্যই কি কাল বিয়ে দাই ?"

দাই মলিনমুখে বলিল,—"নিশ্চয়ই ! আর একটু বাদে তোমার খুড়া বাজার হইতে ফিরিয়া আসিলেই সব ব্যাপার হয়তো তুমি জানিতে পারিবে।"

আমি যে কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। এ জগতে কেহই আমার আপনার বলিবার নাই, কেহই একটা পরামর্শ দিবার নাই। একমাত্র ভরসা সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী, আর্ত্তের রক্ষক, বিধাতা। আর এই কাফ্রি দাই।

কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর আমার মনে পড়িল, মাতৃপ্রদত্ত একখানি বহু মূল্য অলঙ্কার তখনও আমার পেটিকার মধ্যে গোপনে লুকান আছে। সেটী একছড়া রত্নহার। তাহার মূল্য মা বলিয়াছিলেন, দুই হাজার টাকা।

মনে ভাবিলাম, এই রত্নহারের বিনিময়েই আমি এই মহা বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিব।

এই দাই, পিতৃব্যের নিকট হইতে মাসে চারিটী টাকা বেতন পাইত। চারি মুদ্রা বেতনভোগী দাইএর নিকট কি দুই হাজার টাকার রত্নহার একটা বিরাট প্রলোভন নহে? সে কি এই বহুমূল্য হারের লোভ ত্যাগ করিতে পারিবে?

আমি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিয়া, সেই রত্নহার ছড়াটী বাহির করিলাম। তার পর সেটীকে বস্ত্র মধ্যে লুকাইয়া আনিয়া দাইকে তাহা দেখাইলাম। দাই, জীবনে কখনও অমন রত্নখচিত বিচিত্র স্বর্ণ-হার দেখে নাই।

সে বলিল,—"লতিফা! মা! এ বহুমূল্য হার কার? এর দাম কত?"

আমি বলিলাম—"মাহরুণ! এ হার আমি তোকে দিব। তোর বেটার বৌ এই হার পরিবে। এর দাম হ'চ্চে দুই হাজার টাকা। তার চেয়েও বেশী হতে পারে। অনেক হীরা-মতি এতে বসান আছে। হীরা-মতি গুলো খুলে বেচলেও, অতি সহজে এক হাজার টাকা তুই পেতে পারিস।"

দাই সবিস্ময়ে বলিল,—"ও মা! তাহ'লে সোণাশুদ্ধ দু' হাজার টাকা! তা এ হার আমায় দিতে যাচ্ছো কেন? তোমায় আমি মেয়ের মত দেখি যে মা! আমার সঙ্গে কি ঠাট্টা কর্ত্তে আছে?"

আমি বলিলাম—"দাই! আমি ঠাট্টা কর্চ্ছি না। সত্য কথাই তোকে

বল্‌ছি। তুই যদি একটা কাজ কর্ত্তে পারিস্, তা হলে সেই কাজটা হয়ে গেলেই এখনি তোকে এই হার ছড়াটা দোব।”

দাই। কি কাজ মা?

আমি। তুই আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, আমি তোকে এখনি যা বলবো, তা কাউকেও বল্‌বিনি!

দাই। না—

আমি। এ বিবাহ হ'লে আমার সর্ব্বনাশ হবে। সেই লোকটা অতি ভয়ানক শয়তান। শুনেছি, তার বয়স ষাট্ বৎসর। দেখতেও অতি কদাকার। তুই একটা কাজ কর্ত্তে পারিস্ যদি, তা হলে তোকে এই হার এখনই উপহার দিই।

চক্‌চকে হারছড়াটা দেখিয়া দাইয়ের মনে খুব লোভ জন্মিয়াছিল। সে বলিল,—“মা! তোমাকে আমি মেয়ের মত দেখি। তোমার খুড়োর ভয়েই আমি প্রকাশ্যে তোমায় আদর যত্ন দেখাতে পারি নি। তোমার জন্যে আমি সব কর্ত্তে পারি। কি কর্ত্তে হবে বল?”

আমি বলিলাম,—“বসোরাতে আমার এক মাসী-মা আছেন। যদি তুই আজ রাত্রে এই সহরের কোন সরাইখানায় আমাকে পৌছিয়া দিস্, তা'হলে যে কোন ভদ্র মহাজনের সঙ্গে আমি বসোরা যেতে পারি। আর তুই যদি আমার সঙ্গে বসোরা পর্য্যন্ত যাস্ ত তার কথাই নাই। আমার মাসীমার অবস্থা খুব ভাল। সেখানে তোর একটা চাকরী করে দোব। আর মাঝ খান থেকে এই হারছড়াটা ফাঁকতালে তোর নিজের হয়ে যাবে।”

দাই, মনে মনে কি ভাবিল। তৎপরে বলিল,—"তাই হবে। তাই করবো। সত্যি মা লতিফা! এ শয়তানের চাকরী আর ভাল লাগ্‌ছে না। মেয়ে মানুষ আমি, আমায় দিয়ে কোতোয়ালের কাজ করাচ্ছে। আধ পেটা খাওয়া, আর দিন রাত বকুনী। এতে অন্য মেয়ে মানুষ হলে পালিয়ে যেত। কোনও চুলোয় আমার জায়গা নেই, তাই যাইনি। তোমার পালাবার সাহায্য কল্লে, আমার একটা ধর্ম্মের কাজ করা হবে। আমার পেটে একটা মেয়ে হয়নি। ছেলেও লায়েক হয়েছে—খেটে খাচ্ছে। তবে কিসের জন্য গতর খাটিয়ে খাওয়া? এ শয়তানের চাকরী করা?"

আমি দাইএর প্রাণের প্রকৃত কথাগুলি শুনিয়া, বড়ই আশান্বিত হইলাম। মুসাফেরখানায় অনেক সম্ভ্রান্ত বয়োবৃদ্ধ মুসাফের, ব্যবসার জন্য জমায়েত হন। মনে ভাবিলাম, তাঁহাদের মধ্যে হয় ত কেহ না কেহ, আমার পিতার পরিচিত থাকিতে পারেন। তাই যদি না হয়, কন্যারূপে আশ্রয় ভিখারিণী হইয়া, তাঁহাদের একজনকে পিতৃসম্বোধন করিলে, তিনি কি আমায় আশ্রয় দিবেন না—বা সঙ্গে করিয়া বসোরায় পৌছিয়া দিবেন না?

আমি দাইকে বলিলাম,—"তাহা হইলে খুব সাবধানে কাজ করিস্ মা! আজ আমি খুড়ার সরবতের মধ্যে কৌশলে "আগুজার" রস মিশাইয়া দিব। তাহা হইলে কাল সকাল পর্য্যন্ত সে অঘোরে ঘুমাইবে। আর আমরাও ততক্ষণ বহু দূরে চলিয়া যাইব।"

আমাদের এইরূপ পরামর্শই ঠিক হইয়া রহিল। খুল্লতাত সমস্ত দিন ধরিয়া বাজার-হাট করিয়া ক্লান্ত হইয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ীতে

ফিরিয়া আসিলেন। তার পর তিনি ক্রীত দ্রব্যগুলি একটা কক্ষের মধ্যে গুছাইয়া রাখিয়া, আহারাদি শেষ করিলেন। আহারান্তে আমার কক্ষে আসিয়া অতি সহৃদয়তার সহিত বলিলেন,—"লতিফা! তোর বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও জ্ঞান-বুদ্ধি পাকে নি। এই জন্য আমি তোর ভালর জন্য যা কিছু করি, তুই তার সবই বিপরীত বুঝিস্। যাই হোক, আমি আর কয় দিন মা! আমি থাক্‌তে থাক্‌তে, তোর একটা উপায় করে দিতে ইচ্ছা করি।"

খুল্লতাতের কথায় ভূমিকার বহর দেখিয়াই আমি বুঝিলাম, যে তাহার মনের প্রকৃত কথা কি? আমি তাঁহার চিত্ত তুষ্টির জন্য, বলিলাম,—"তা কি আমি জানি নি। আপনি না থাক্‌লে কাকা, আমি যে কোথায় ভেসে যেতুম, তাও আমি বুঝি। তবে আমার মনটা সর্ব্বদা ভাল থাকে না। এই জন্য আপনি হয় ত মনে করেন, আমি আপনার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট!"

খুল্লতাত আমার এই কথা শুনিয়া, ভারি সুখী হইলেন। তিনি বলিলেন,—"এই বার যাতে তোর মন ভাল থাকে, তার বন্দোবস্ত আমি করেছি। মেয়ে হয়ে জন্মেছিস্। চির দিন কি বাপ-খুড়ার কাছে থাক্‌বি? আমি এক ধনী মহাজনের সঙ্গে তোর বিবাহ দোব লতিফা! দোব নয়—কাল রাত্রেই তোর বিয়ে। তোকে অপরের বাড়ী পাঠাতে আমার খুবই একটা কষ্ট হবে। কেন না, অনেক কষ্টে তোকে কোলেপীঠে করে মানুষ করেছি। কিন্তু তা'হলে কি হয়, তোকে সুখী করাও ত আমার একটা

প্রধান কর্ত্তব্য। দাদা মরবার সময় পুনঃপুনঃ আমাকে বলে গিয়েছিলেন—লতিকাকে সুপাত্রে দিও ভাই।"

গুরুজনের সম্মুখে বিবাহের কথা উঠিলে, পূর্ণ যুবতী যেমন স্বভাবতই একটা লজ্জায় অধীরা হইয়া পড়ে, আমি সেইরূপ একটা ভাবের অভিনয় করিলাম। লজ্জাবনত মুখের আরক্তিম ভাব, ও আমার নির্ব্বাক অবস্থা দেখিয়া, খুল্লতাত বুঝিলেন—তাহার প্রস্তাব আমার পক্ষে অপ্রীতিকর হয় নাই।"

(৮)

রাত্রি, দুই প্রহরের কাছাকাছি হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া, আমি নিদ্রিতা দাইকে জাগাইলাম। বলা বাহুল্য খুল্লতাতের সরবতের সহিত আমি উপযুক্ত সময় বুঝিয়াই, পূর্ব্বোক্ত মাদক দ্রব্য মিশাইয়া দিয়াছিলাম।

নিঃশব্দপদসঞ্চারে, তাঁহার কক্ষে গিয়া দেখিলাম, তিনি অঘোরে ঘুমাইতেছেন। আমি তখনই দাইকে সঙ্গে লইয়া, অন্ধকারে শরীর ঢাকিয়া বাটীর বাহির হইলাম।

আমাদের দুই জনের আপাদমস্তক কৃষ্ণবর্ণ বোর্‌খায় ঢাকা। চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। এই অন্ধকারই আমাদের বাধাহীন পলায়নের সহায়তা করিল।

আমি সরাইখানায় পৌছিয়া, স্ত্রীলোকেরা যে ঘরে থাকে, তাহারই

একটি কক্ষে প্রবেশ করিলাম। অনেক মহাজনই কন্যা-পরিবার সঙ্গে লইয়া ব্যবসা উদ্দেশ্যে একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইত। আমি এইরূপ কোন মুসাফেরেরই সন্ধান করিতেছিলাম। আমার অদৃষ্ট ক্রমে, মিলিলও একজন।

দেখিলাম, এক গৃহিণীগোছের স্ত্রীলোক, চাকরকে দিয়া তাঁহার মাল পত্র বাঁধাইতেছেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন কোন সম্ভ্রান্তকুলোদ্ভবা।

আমি বলিলাম,—"মা! আপনারা কি আজ রাত্রেই স্থানান্তরে যাইবেন?"

তাঁহার দয়া ও সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য, সঙ্গেসঙ্গেই আমার মুখের আবরণটা খুলিয়া দিয়াছিলাম। তিনি আমার মুখের দিকে কিয়ংক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর বলিলেন,—"কে তুমি? তোমার ইচ্ছা কি? পরমাসুন্দরী মেয়ে তুমি! কিন্তু বিদেশে একলা কেন মা?"

আমি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিলাম,—"আমি এক পিতৃ-মাতৃহীনা অনাথিনী। ভদ্র বংশে আমার জন্ম। এক সময়ে আমাদের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। মা! বসোরা নগরে আমার এক মাসী আছেন। তাঁর কাছে আমি যাইতে চাই। তিনি ছাড়া আমার অভিভাবক বা আপনার জন কেহই নাই। সম্বলের মধ্যে এই বাঁদী। আপনারা বোধ হয়, এখনই এ সরাই ত্যাগ করিবেন। এ অভাগিনীকে যদি সঙ্গে লন মা!"

সেই রমণী অতি দয়াবতী। তিনি প্রসন্ন মুখে বলিলেন,—"তা আর

বেশী কথা কি? আমার স্বামীও বসোরায় যাইতেছেন। তা তুমি না হয় আমাদের সঙ্গে চল। তুমি প্রস্তুত হও গে। কেননা আমরা এখনই এই সরাইখানা ত্যাগ করিব।"

আমি প্রসন্নমুখে বলিলাম,—"আমি প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছি। আপনারা যখনই যাইবেন, তখনই আমি যাইতে প্রস্তুত। বসোরায় যাইবার প্রয়োজনীয় পাথেয় অর্থাৎ উটের গাড়ীর ভাড়া ইত্যাদিতে কি লাগিবে মা?"

গৃহিণী সহাস্যমুখে বলিলেন—"আরে পাগল মেয়ে! সে জন্য তোমার ভাবনা কেন? আমাদের ঘরের উটের গাড়ি আছে। তুমি আর তোমার বাঁদি, আমাদের সেই গাড়িতেই যাবে। গাড়ীতে স্থান যথেষ্ট।"

তিনি তাঁহার স্বামীকে তখনই আমার কথা বলিয়া আসিলেন। তাহার স্বামী পক্ককেশ ও বয়োবৃদ্ধ। আকারে লক্ষীমন্ত ব্যক্তি। তিনি কোন আপত্তি করিলেন না।

সেই সরাইখানা হইতে বাহির হইতে পারিলেই যেন বাঁচি। ঠিক রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়, আমরা সহর ত্যাগ করিলাম। ঘণ্টা দুই তিন পরে আমরা এক মরুভূমিতে আসিয়া পৌঁছিলাম। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। সম্মুখের পথ দেখিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু সেই পথ, উষ্ট্রচালকদের নিকট বিশেষ পরিচিত। এক দলে অনেকগুলি সার্থবাহ জুটিয়াছিল। সব সমেত একদলে আমরা বিশ পঁচিশ জন লোক ছিলাম।

কিন্তু বোধ হইল ভাগ্য যেন আমাদের সকলেরই উপর অপ্রসন্ন। কারণ

প্রায় তিন ক্রোশ অতিবাহিত করিবার পর, আমাদের দলের যে প্রধান পথপ্রদর্শক তাহার পথ ভ্রান্তি হইল। আমরা এক জঙ্গলপূর্ণ পাহাড়ের তলে, উপস্থিত হইলাম। সম্মুখে আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই।

তখন সূর্য্য উঠিবার অনেক বিলম্ব থাকিলেও, উষার আলোকে আকাশটা অনেক ফরসা হইয়াছে। সর্ব্ববাদীসম্মতি ক্রমে স্থির হইল, সূর্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত, অবশিষ্ট রাত্রের মত পাহাড়ের নীচের ঢালু-জমীতে বিশ্রাম করিতে হইবে। প্রভাত হইলে যাহা হয় করা যাইবে।

সহসা সেই পার্ব্বত্য উপত্যকার অপর দিকে জঙ্গলের মধ্যে কতকগুলি আলোকরেখা দেখা দিল। আমাদের দলের প্রধান সেই মহাজন ও আর সকলে তর্কবিতর্ক করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, নিশ্চয়ই আর একদল পান্থ অপরদিক হইতে আসিতেছে। আর খুব সম্ভবতঃ, তাহারা মৌশলের কিম্বা বসোরার যাত্রী।

কিন্তু এটা আমাদের সাংঘাতিক ভ্রম। তাহারা পান্থ নয়, দুর্দ্দান্ত আরব-দস্যু। এমনভাবে তাহারা অগ্রসর হইতেছিল—তাহা দেখিলে ব্যবসায়ীর দল বলিয়াই বোধ হয়। কাছে আসিয়াই তাহারা নিজমূর্ত্তি ধরিল। তাহাদের অনেকের হাতে শাণিত তরবারি। বর্শা ও পিস্তল সকলেরই সঙ্গে। তাহারা আমাদের দলকে সবেগে আক্রমণ করিল। দুই দলে ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়া গেল। আমাদের দলের অনেকে হতাহত হইল। যে মহাজনের পরিবারের সঙ্গে আমি আসিয়াছিলাম, সেই মহাজন এই দাঙ্গায় নিহত হইলেন। যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহাদের কে কোথায় যে

সেই মরুভূমির বিরল অন্ধকারের মধ্যে লুকাইল, তাহার কোন সন্ধানই হইল না। আর সন্ধানইবা করে কে?

আমি ও সেই মহাজনের স্ত্রীকন্যা, ডাকাতের হাতে বন্দী হইলাম। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ডাকাতেরা উটের গাড়ীর মধ্যে পুরিল। আমাদের চালককে নিহত করিয়া ডাকাতদেরই একজন শকট-চালকের কাজ আরম্ভ করিয়া দিল।

আমরা তিনজনেই এই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া, ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। যখন আমাদের চেতনা হইল, তখন আমরা সবিস্ময়ে দেখিলাম, গভীর জঙ্গলের মধ্যে এক ভাঙ্গা বাড়ীতে ডাকাতেরা আমাদের আনিয়া রাখিয়াছে। বলা বাহুল্য, নিরাপদতার জন্য আমি আমার সেই স্বর্ণহার ছড়াটী মহাজন পত্নীর হাতে দিয়াছিলাম। তিনি তাঁহার পেটিকা মধ্যে তাহা রাখিয়া দেন। বলা বাহুল্য, এই পেটিকাও দস্যুগণের হস্তগত হইয়াছিল। আমার সঙ্গিনী দাই, আর একখানি উষ্ট্রচালিত গাড়ীর মধ্যে ছিল। সে যে কোথায় গিয়াছে, মরিয়াছে কি বাঁচিয়া আছে, তাহার কোন সংবাদই আমি পাইলাম না। সেই মরু দস্যুপতির নাম যে আব্বাস, এটা তাহাদের কথোপকথনের মধ্য হইতেই জানিয়াছিলাম।

আব্বাস, তাহার সঙ্গীদের সম্বোধন করিয়া বলিল—"এই দলের লোককে আক্রমণ করিয়া টাকাকড়ি আমরা যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহাতে আমাদের মেহনতআনা পোষায় নাই। এই দলে দুইটী সুন্দরী যুবতী আছে। ইহাদের বিক্রয় করিলে বোধ হয় আমরা দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা

পাইতে পারি। কথাটা শুনিবা মাত্রই আমি ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম। সুন্দরী যুবতীর মধ্যে, আমি আর সেই মহাজনের এক কন্যা।

দলপতির আদেশ পাইয়া, দুইজন কৃতান্তের মত কৃষ্ণকায় দস্যু অগ্রসর হইয়া প্রথমে আমাকেই বলপূর্ব্বক এক উষ্ট্রশকটে তুলিল। মহাজন গৃহিণী ও তাঁহার কন্যা, সেই দস্যু নিবাসেই রহিলেন।

এসব দুঃখের কথা সবিস্তারে বলিতে চাহি না। ইহার পর আমি এক ক্রীতদাস ব্যবসায়ীর হস্তে পড়িলাম। সে পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রা গণিয়া দিয়া, আমাকে ক্রীতদাসীরূপে ক্রয় করিল।

এই ঘটনার পনর দিন পরে, সে আমাকে ও পূর্ব্বে ক্রীত আমার মত আরও দশটী সুন্দরী ক্রীতদাসীকে, মিশরে লইয়া আসিল। যে প্রাসাদে তুমি এখন আছ, আর আমি যেখানে বসিয়া এখন জীবনকাহিনী ব্যক্ত করিতেছি, তাহা মিশরের প্রবল পরাক্রান্ত সুলতানের। এই কায়রো মিশরের রাজধানী। সুলতান এই প্রাসাদেই বাস করিয়া থাকেন। আর এই সহরের প্রধান শাসনকর্ত্তা, যিনি সুলতানের অপেক্ষাও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ—যাঁহার নাম সমসেরজঙ্গ—তিনি এই প্রাসাদের পার্শ্বের রাজ-বাড়ীতেই থাকেন। এই ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী যে সকল বাঁদীকে সুলতানের নিকট বিক্রয়ার্থে আনয়ন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে তিনি আমাকেই বিশেষ পছন্দ করিলেন। অন্য সকলকে তিনি এক স্বতন্ত্র মহলে পাঠাইয়া দিয়া, তাঁহার প্রধান খোজাকে আদেশ করিলেন—"ইহাকে আমার খাস্ মহলে লইয়া যাও। বেগমের মত সম্মান করিও।"

আমি সুলতানের মহলে আসিলাম। দেখিলাম, আমার ব্যবহার জন্য কয়েকটা রাজোচিত সজ্জাপূর্ণ, কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এরূপ বহুমূল্য সজ্জাপূর্ণ কক্ষ আর কখনও আমার নয়ন গোচর হয় নাই। দশজন সুন্দরী বাঁদি, আমার পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত হইল। আমি ক্রীতদাসী হইয়া ও রাজরাণীর সমাদর পাইলাম।

সেই দিনই সন্ধ্যার পর, সুলতানের সহিত আমার প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎ হইল। সুলতান হাস্যমুখে আমাকে বলিলেন—"লতিফা! যদিও আমি তোমাকে ক্রীতদাসীরূপে ক্রয় করিয়াছি, তাহাহইলেও আমি এই মুহূর্ত্ত হইতেই, তোমাকে দাসীত্বমুক্ত করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা দিলাম। তুমি আমার এই নবনির্ম্মিত মহলের অধীশ্বরী হইলে। ইতিপূর্ব্বেই বাঁদীগণ তোমার পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। আর আমিও আজ হইতে তোমার ক্রীতদাস হইলাম। কেমন তুমি আমার এ ব্যবস্থায় সুখী হইয়াছ—ত ?"

আমি নিরুত্তরে রহিলাম দেখিয়া, সুলতান বলিলেন—"আমি অনেক সুন্দরী বাঁদী কিনিয়া আমার এই রংমহলে রাখিয়াছি, কিন্তু তোমার মত একটাও এ মহালে নাই। তোমায় দেখিবামাত্র আমি তোমার চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। সুন্দরী লতিফা! এই "নীলনদ মেখলা পর্ব্বতমণ্ডিতা মিনার-মস্‌জেদ-শোভিতা মিশরের অধীশ্বর আমি। তুমি কি আমার হইবে না ?"

মিশরের অধিপতি দেখিতে বেশ সুপুরুষ। এত ক্ষমতা তাঁর যে

তাঁহার হুকুমে মানুষ মরে বাঁচে। কিন্তু সুলতানের সহিত, অল্পক্ষণের বাক্যালাপে বুঝিলাম, তিনি আমার সৌন্দর্য্য দেখিয়া খুবই মোহিত হইয়াছেন। আমায় তিনি বিলাসের দাসীরূপে মহল মধ্যে রাখিতে চান।"

মনে মনে এইটুকু বুঝিলাম—নিজের নারীসম্ভ্রম বজায় রাখিতে হইলে, অবসর বুঝিয়া পলায়ন করিতে হইলে, এই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ-সুলতানকে হাতে রাখা একান্ত প্রয়োজন। কাজেই আমি তাঁহার প্রেম প্রস্তাবে এ পর্য্যন্ত কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করি নাই। বরঞ্চ তাঁহার উপর একটা কপট সহানুভূতি দেখাইয়া আসিতেছি।

আমি যাহাতে সর্ব্বদা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকি, সুলতান তাহার সকল বন্দোবস্তই করিয়া দিয়াছেন। দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবারও স্বয়ং আসিয়া আমার সংবাদ লইয়া থাকেন। যতক্ষণ আমার কাছে থাকেন ততক্ষণই হাস্যমুখে কথাবার্ত্তা কহেন।

আমার এই সৌভাগ্য দেখিয়া, হারেমের অনেক রূপসী বাঁদী, যাহারা সুলতানের নিকট অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষা করিত—আমার শত্রু হইল। কিসে আমি সুলতানের বিরাগভাজন হই, গোপনে এইরূপ একটা চক্রান্ত করিতে লাগিল। অথচ তাহারা আমার আজ্ঞাবাহী সহচরী বই আর কিছুই নয়।

একদিন সুলতান আমার কক্ষে আসিলেন। আমি শয্যার উপর চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিলাম—নিজের অদৃষ্ট কথা ভাবিতেছিলাম। সুলতানকে দেখিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, তাঁহাকে কুর্ণিস করিলাম।

সুলতান আমার পার্শ্বে বসিয়া, স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন—"লতিফা! কেমন আছ তুমি?"

আমি সহাস্যমুখে বলিলাম—"জাঁহাপনার অনুগ্রহে আমার কোন কষ্টই নাই। খোদা আপনার মঙ্গল করুন।"

সুলতান আমার হাত দুইখানি ধরিয়া, মৃদুভাবে নিপীড়িত করিয়া সহাস্য মুখে বলিলেন—"আম কত দিন এভাবে যন্ত্রণা সহ্য করিব লতিফা? আমি যে তোমায় আমার সর্ব্বস্ব দিয়াছি। এই মধুর বসন্তেও কি তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হইবে না? আমি এই সুদূর বিস্তৃত, ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বর্ণভূমি মিশরের একমাত্র দণ্ডমুণ্ডবিধাতা। সকল দেশের সেরা সুন্দরী বাঁদি, এই মহলের মধ্যে। কিন্তু তোমায় আমি বাঁদীরূপে কিনিয়াও তোমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছি। তোমাকে রাজরাণীর মত সমাদর করিতেছি। আমি ইচ্ছা করিলেই, তোমাকে আমার আয়ত্বাধীন করিয়া লইতে পারি। কিন্তু সে প্রবৃত্তি আমার নাই। যেদিন তুমি স্বেচ্ছায় আত্ম-সমর্পণ করিয়া আমার কণ্ঠলগ্না হইবে, সেই দিন আমি তোমায় "সুলতানা" করিয়া দিব। রাজরাজেশ্বরীর মত তুমি এই মহলে বিরাজ করিবে।"

এক প্রবল পরাক্রান্ত দেশাধিপের মুখে, এরূপ সৌজন্যপূর্ণ কথা শুনিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম। তাঁহার এই সহৃদয়তার জন্য, আমার প্রাণে একটা নূতন আশার আলোক দেখা দিল। মনে ভাবিলাম—এই বিলাসপুষ্ট নিত্যনূতনসুন্দরীসাহচর্য্যলোলুপ সুলতানের প্রাণে মহত্ব বলিয়া একটা গুণ তখনও বর্ত্তমান।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সুলতান সুকান্তিময়। কিন্তু মনে মনে যখন ভাবিতাম, যে অসংখ্য সুন্দরীর নায়ক তিনি, তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যতদিন আমার এ সৌন্দর্য্য থাকিবে, তত দিন আমার সৌভাগ্যও থাকিবে। তারপর আমি বৃন্তচ্যুত শুষ্কপ্রসুনের ন্যায় পদদলিতা হইব।

এইজন্য আমি জোড়হস্তে বলিলাম—"জাঁহাপনা! আমার জীবন মরণের বিধাতা যখন আপনি, তখন আপনার এই অপূর্ব্ব শিষ্টতাময় কথার উত্তরে কোন কিছু বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তবে জনাবালি আমার উপর এপর্য্যন্ত যেভাবে অনুগ্রহ দেখাইয়া আসিতেছেন, তাহাতেই ভাবিতেছি, আমার মত ভাগ্যবতী রমণী এ রাজান্তঃপুরে খুব কম আছে। সম্প্রতি আমার পিতামাতার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহাদের শোকে আমি বড়ই কাতরা। তারপর দস্যুহস্তে পতন, ক্রীতদাসীরূপে আপনার এ অন্তঃপুরে আগমন আর এই অপূর্ব্ব ভাগ্যপরিবর্ত্তন। পাছে আপনি এ বাঁদির প্রতি অপ্রসন্ন হন, এইজন্যই আমি জাঁহাপনাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, বিষণ্ণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া এ পর্য্যন্ত এরূপ একটা প্রফুল্লভাব দেখাইয়া আসিতেছি। আমায় আরও একমাস সময় দিন জাঁহাপনা! আমার চিত্ত স্বাভাবিক অবস্থায় আসিলেই—আমি আপনার বাঁদিগিরিতে নিযুক্ত হইব।"

সুলতান একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া, আমার কথাগুলি শুনিতেছিলেন। তারপর তিনি কি ভাবিয়া, আমার দক্ষিণ হস্তটী চুম্বন করিয়া বলিলেন—"তাহাই হউক লতিফা! আমি তোমার প্রস্তাবেই

সম্মত হইলাম। তবে তোমায় যে ভাবে দুই এক দিন অন্তর দেখিয়া যাই, তাহা করিতে আমি বিরত হইব না। কারণ—তোমাকে দেখিলে আমার প্রাণ যেন জ্যোৎস্নার আলোকে ভরিয়া উঠে। তোমায় স্পর্শ করিলে—আমি ধন্য হই। তোমার কথায়, আমার প্রাণে বীণার ঝঙ্কার বাজিয়া উঠে। কি একটা তৃপ্তি, কি একটা অনাবিল আনন্দ, তোমার সাহচর্য্যে পাই আমি লতিফা! যাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।"

এই সব কথাবার্ত্তার পর সুলতান মহলে চলিয়া গেলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম, কথাটা এইভাবে বলিয়া বড়ই সুবুদ্ধির কাজ করিয়াছি। বুঝিলাম, আরও এক মাস কাল আমি এইভাবে নারীসম্মান রক্ষা করিয়া স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারিব।

এই অসংখ্য-রমণীনায়ক, প্রবৃত্তির দাস, উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র, অসংযত চিত্ত, সুলতানের প্রেমপাত্রীরূপে এই রত্নমণ্ডিত রাজপ্রাসাদে বাস করা অপেক্ষা, পর্ণকুটীরে অবস্থাহীন কোন ভদ্র সন্তানের বিবাহিত পত্নীরূপে বিরাজ করা যে পরম সৌভাগ্য, এইরূপ একটা উজ্জ্বল স্বপ্ন, আমার হৃদয়কে তখনও খুব দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছিল।

হে যুবক! তোমাকে দেখিবার পর হইতে, আমার মনের সে দৃঢ়তা এখন একটু শিথিল হইয়াছে। তোমার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে তুমি প্রাণ সমর্পণ করিতে শিখিয়াছ। প্রহরীদের হস্তে ধৃত হইয়া লাঞ্ছিত অপমানিত, এমন কি নিহত হইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও, আর প্রতিদিনই মৎকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াও যখন তুমি, আমার গবাক্ষনিম্নে

দেখা দিয়াছ, তখন বুঝিলাম—প্রেমের প্রকৃত উপাসক তুমি। মৃত্যুভয় তোমার পক্ষে কিছুই নয়। যে নিস্বার্থভাবে ভালবাসিতে পারে, সে মৃত্যুকে আদৌ ভয় করে না। স্বার্থকলঙ্কশূন্য ভালবাসা, ভালবাসার জন্যই ভালবাসা যার প্রাণে আছে, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের উপর রমণীর একটা স্বাভাবিক সহানুভূতি আপনিই আসিয়া থাকে। এই জন্যই আমি তোমাকে এই বিপদজনক উপায়ের মধ্য দিয়া, হারেমের মধ্যে আনিয়াছি। কিন্তু এরূপভাবে যাতায়াতেও বিপদ আছে। কারণ এই মহলের বাঁদিরাই আমার মিত্ররূপী মহা শত্রু।”

লতিফা, এইভাবে তাহার জীবনের কথাগুলি বলিয়া গেল। আমি ভাবিলাম—দুইটী বিপন্ন, ছিন্নভিন্ন বিভিন্ন অদৃষ্ট, ঘটনাচক্র পরিচালনে একস্থানে আসিয়া মিশিয়াছে!

তখন প্রভাত হইয়াছে। আকাশ গাত্র অরুণরাগ রঞ্জিত না হইলেও, তখনও অন্ধকারের কৃষ্ণ ছায়া, প্রকৃতির মুখচ্ছবিকে ঢাকিয়া রাখিলেও, প্রভাত হইবার বেশী বিলম্ব নাই।

লতিফা বলিল—“প্রিয়তম! তুমিও যেমন আমায় দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলে, আমিও ঠিক সেইরূপ হইয়াছিলাম। আজ আর তুমি বিলম্ব করিও না। আর একটু পরেই সুলতান—প্রাতঃভ্রমণের জন্য অন্দরের পার্শ্বস্থ উদ্যানে আসিবেন! কাল আর আসিও না। পরশ্ব মধ্যরাত্রে তুমি আবার এই জানালার নীচে আসিয়া দাড়াইও। আবার আমরা এইভাবে মিলিত হইব।”

আমি আর বেশী বিলম্ব করিতে পারিলাম না। লতিফা আমায় সঙ্গে করিয়া বাতায়ন পার্শ্বে পৌছিয়া দিল। আমি সেই রজ্জু নির্ম্মিত অধিরোহণী সহায়তায়, প্রাচীরের বাহিরে নামিয়া আসিলাম।

স্নিগ্ধ প্রভাত সমীরচুম্বিত, স্রোতস্বতীর শীতলশীকরকণা ললাটস্থ শ্রম সঞ্জাত ঘর্ম্মবিন্দুকে লোপ করিয়া দিল। বালার্ককিরণের স্বর্ণচ্ছটায় সুনীল নীল নদের সলিলরাশি স্বর্ণরাগরঞ্জিত হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই দেখিয়া, আমি দ্রুতপদে আবাসস্থানে—ফিরিয়া আসিলাম।

(৯)

বাটীতে ফিরিয়া স্নানাদি শেষ করিয়া, নিজের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম। একপেয়ালা কফি, ও কয়েকখানি খর্জ্জুরের মিঠা-পিটা খাইয়া ক্ষুণ্ণবৃত্তি করিলাম।

মনে ভাবিলাম—"অতীত রাত্রের ব্যাপারটা সবই যেন এক বিচিত্র স্বপ্নের মত! লতিফার শোচনীয় জীবন কাহিনী শুনিয়া, তাহার উপর আমার খুবই একটা সহানুভূতি জন্মিয়াছিল। তাহার সেই অনিন্দ্যসুন্দর রূপজ্যোতি, আমার শিরার প্রত্যেক রক্তকণিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল! কিছুতেই তাহাকে ভুলিতে পারিলাম না।

আমি জাগরণে দেখিতে পাই—লতিফা আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অপাঙ্গদৃষ্টিতে মৃদুহাস্যের সহিত বলিতেছে—"অতদূরে দাঁড়াইয়া কেন

তুমি!” স্বপ্নে দেখি—জ্যোৎস্নামণ্ডিতা এক পরীর রূপ ধারণ করিয়া লতিফা আমার শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিতেছে—“এই দেখ! আমি আবার আসিয়াছি।”

এই এক দিনেই লতিফা আমার ধ্যানের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। আমি, নিদ্রায়, জাগরণে, আহারে বিহারে, লতিফার চিন্তায় দিন কাটাইতে লাগিলাম। হায়! কেন আমার এ দুর্ম্মতি হইয়াছিল? কেন তখন আমি এই লোকের জন্য, অতটা ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলাম? ভাগ্য যে আমায় অতটা ছলনা করিবে, তাহা ত আমি একটুও জানিতে পারি নাই। কেই বা কবে পারিয়াছে? এত প্রজ্ঞাদৃষ্টি কার?

দিবাভাগটা সুখের কল্পনায়, আশা প্রতীক্ষায় কাটিয়া গেল। গভীর রাত্রে, যথা সময়ে আমি কম্পিতহৃদয়ে সেই গবাক্ষ নিম্নে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম পূর্ব্বের মত গবাক্ষ গাত্রে সেই রজ্জুময় সোপান ঝোলান আছে। আমি এই ঘটনা হইতে বুঝিলাম, এই দুই দিনের অদর্শনেও আমি লতিফার হৃদয় হইতে একবারে সরিয়া পড়ি নাই।

আমি সোপান বহিয়া উপরে উঠিলাম। দেখিলাম, লতিফা সেই গবাক্ষ পার্শ্বে আত্মগোপন করিয়া আছে। সে আমায় দেখিয়াই আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিল—“মনসুর আলি! আমি তোমার আশাপথ প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছি! সুলতান আজ অসুস্থ। তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন, আজ আর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না। এস প্রিয়তম! আমার সঙ্গে!”

লতিফা, আমার হাত ধরিয়া পূর্ব্বদিনের সেই কক্ষমধ্যে লইয়া গেল। কক্ষটী সদ্যপ্রস্ফুটিত অসংখ্য প্রসূনবাসে পরিপূর্ণ। চারি দিকে গন্ধভরা পুষ্পস্তবক। আমি সহাস্যমুখে লতিফার পার্শ্বে বসিয়া বলিলাম—"আজ এ ফুলের বাসরসজ্জা কেন লতিফা?"

লতিফা সহাস্যমুখে বলিল—"সে দিন তুমি চোরের মত, ভয়ে ভয়ে এ কক্ষে আসিয়াছিলে। এজন্য তোমার কোন সম্বর্দ্ধনা করিতে পারি নাই। আজ তাই ফুলরাশি দিয়া তোমার অভ্যর্থনা করিতেছি।"

আমি লতিফার দক্ষিণ হস্তখানি ধরিয়া, আগ্রহভরে চুম্বন করিয়া বলিলাম—"যে স্পর্শ আমি এইমাত্র অনুভব করিলাম, তাহা কি প্রসূন কলিকা অপেক্ষাও সুকোমল নয়? যে সুগন্ধি নিশ্বাসের আঘ্রাণ—আমি এইমাত্র পাইলাম, তাহা কি তোমার সযত্নে রচিত বিচিত্র কুসুমমালিকার অপেক্ষা সুগন্ধ মাখা নয়? তোমার হাসিমুখের মিষ্ট কথা, সুনীল নয়ন দুটীর করুণাস্নেহমাখা চাহনি কি, আমার পক্ষে উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা নয় লতিফা?"

লতিফা বলিল—"তোমার অতিপ্রশংসায় আমি যে গলিয়া যাইব তাহা মনে করিও না। একেবারে এতটা ভাল নয়। রহস্য থাক। আমি তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। কাল সমস্ত রাত্রি ধরিয়া আমি সেটা ভাবিয়া রাখিয়াছি।"

আমি বলিলাম—"কি কথা লতিফা?"

লতিফা। তুমি ত আমায় ভাল বাসিয়াছ। সত্য বল দেখি, এটা রূপের মোহ, না শয়তানের প্রলোভন?

আমি। কি করিয়া তোমায় জানাইব লতিফা—যে আমার ভালবাসা স্বার্থকলঙ্কশূন্য ! ভালবাসিবার জন্যই, আমি ভাল বাসিয়াছি। যদি এই বক্ষঃস্থল, কোন শাণিত অস্ত্র দিয়া উন্মুক্ত করিয়া দেখিতে পার, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে এ হৃদয়ে, তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই। তুমিই এই অভিশাপগ্রস্ত মরুময় জীবনের ধ্যানধারণা ও এই দুনিয়ায় আমার চক্ষে একমাত্র দুর্ল্লভ রত্ন।"

লতিফা। তাহা হইলে এক কাজ কর। সুলতানের প্রাসাদে এই রাণীগিরি আমার একটুও ভাল লাগিতেছে না। আমি কাল সারারাত ভাবিয়া স্থির করিয়াছি, এই স্বর্ণমণ্ডিত মর্ম্মরনির্ম্মিত, সহস্র আলোকমালাপূর্ণ কক্ষ অপেক্ষা, অন্ধতমসাচ্ছন্ন স্বাধীনতার কুটীরও আমার পক্ষে ভাল। আমি আজও পর্য্যন্ত কৌশল করিয়া নিজের নারীসম্মান ও কুমারীধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছি। সুলতানের নিকট যে একমাসের করার করিয়াছিলাম, তাহাও কাল শেষ হইবে। এখন আমি তোমার সাহায্যপ্রার্থিনী। পরামর্শ ভিখারিণী।

আমি। তুমি আমায় যা করিতে বলিবে, তাই করিব লতিফা।

লতিফা। তুমি যদি সুলতানকে হত্যা করিতে পার, তাহা হইলে আমি নিষ্কণ্টক হই—নির্ভয়ে থাকি।

আমি। কোমলহৃদয়া নারী হইয়া তুমি একথা বলিতেছ লতিফা? এটা কি তোমার মনের কথা! না আমায় পরীক্ষা করিতেছ।

লতিফা। মনের কথা বই কি। তোমার পরীক্ষা আমি প্রথম

দিনেই করিয়াছি। যদি তুমি না পার, নারীসম্মান ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য, আমাকেই সুলতানের রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিতে হইবে!

আমি। পারিবে কি? তা তুমি যদি নারী হইয়া এ নৃশংস কাজ করিতে পার, তাহা হইলে আমি পারিব না কেন? তোমার ধর্ম্মরক্ষার জন্য, তোমাকে উদ্ধারের জন্য যাহা করিতে বলিবে, তাহাতেই আমি প্রস্তুত।

এই কথা শুনিয়া লতিফা তখনি উঠিয়া গিয়া, এক মর্ম্মরমণ্ডিত কুলুঙ্গীর মধ্য হইতে মখমলমণ্ডিত, কোষ নিবদ্ধ একখানি ছোরা লইয়া আসিল। খুলিবামাত্র, সে ছোরাখানি দীপালোকে চক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল। লতিফা সেখানি আমার হাতে দিয়া বলিল—"এই নাও! এস আমার সঙ্গে। সুলতান কোন কক্ষে নিদ্রিত, তাহা আমি তোমাকে দেখাইয়া আনিগে চল।"

মনে মনে ভাবিলাম—"এই কুসুমকোমলা নারী এত রক্তপিপাসিনী কেন? এর প্রাণে কি একটুও মমতা নাই?"

আমায় ভাবিতে দেখিয়া লতিফা বলিল—"পারিবে না মনসুর! দেখিতেছি, এখনিই তোমার মুখ শুখাইয়া গিয়াছে। হাত কাঁপিতেছে। না—না তুমি অতি কাপুরুষ। এখন বুঝিলাম—তুমি আমায় ভাল বাস না। এই নরক যন্ত্রণা হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে তোমার ইচ্ছা নাই, আত্মত্যাগের শক্তি নাই, হৃদয়ে সাহস নাই।"

আমি একটু রুষ্টভাবে বলিলাম—"খোদা আমার মনের ভাব

জানেন। আমি তোমাকে সুলতানের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিতে একান্ত উৎসুক কি না, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানে! দাও! অই শাণিত ছুরিকা আমার হস্তে। চল—সেই কক্ষে, যেখানে সুলতান আছেন।”

লতিফা, দ্বার খুলিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইল। আমি তাহার পশ্চাতে। কিয়দ্দূর গিয়া, লতিফা আমার দক্ষিণ বাহু টিপিয়া, অতি অস্ফুটস্বরে বলিল—“অই! সেই কক্ষ! ঐ কক্ষে সুলতান নিদ্রিত! আমার উদ্ধারের একমাত্র উপায়, সুলতানকে হত্যা করিয়া এ স্থান হইতে আজই পলায়ন করা। দৃঢ়মুষ্টিতে, ঐ ছোরাখানা ধর। একটুও কাঁপিও না। ভয় পাইয়া চীৎকার করিলেই সর্ব্বনাশ হইবে। সুলতান জাগিয়া উঠিলে তুমি ও আমি দুই জনেই মরিব।”

আমি বিকারগ্রস্ত রোগীর মত লতিফার এই ভীষণ আদেশ পালন জন্য, সুলতানের কক্ষদ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছি, এমন সময়ে দ্রুতবেগে আসিয়া সে সবলে আমার হাতখানি চাপিয়া ধরিল। কোন কিছু না বলিয়া তাহার কক্ষ মধ্যে আমায় সবেগে টানিয়া লইয়া চলিল।

এই লতিকা কি মায়াবিনী! দেখিলাম—সে আমার পার্শ্বে বসিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতেছে! একটু আগে যে আমাকে এক মহাপরাক্রান্ত দেশাধিপ সুলতানকে হত্যা করিবার জন্য, উত্তেজিত করিয়াছিল, পলায়ন বাসনা যাহাকে দানবীমূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল, এখন দেখিতেছি, সে হাস্যময়ী দেবীমূর্ত্তিতে পরিণত। কি এ অদ্ভুত প্রহেলিকা?

লতিফা আমার চিত্তের এই বিপ্লবময় অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিল, "প্রিয়তম! এখন আমি বুঝিতেছি, যোগ্যজনেই আমি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। সুলতান এ প্রাসাদে থাকেন না। কখনও যদি থাকেন, তাঁহাকে হত্যা করা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। কেন না—তাঁহার শয়ন কক্ষে উপস্থিত হইতে হইলে, অনেক প্রহরীর দৃষ্টি অতিক্রম করিতে হয়। তুমি আমাকে কতটা ভালবাস, আমার জন্য কতটা আত্মত্যাগ করিতে পার, তাহা পরীক্ষার জন্য আমি এরূপ একটা অদ্ভুত পরীক্ষার অভিনয় করিতে-ছিলাম। তোমায় যে কষ্ট দিয়াছি, তাহার জন্য আমি মার্জ্জনা ভিক্ষা করি।"

এই কথা বলিয়া, বাসন্তীলতিকার মত বিচিত্র শোভাময়ী সেই লতিফা সুন্দরী, আবেগভরে আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিল। এ আলিঙ্গনে আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। মর্ম্মসন্ধিতে বিদ্যুতস্রোত বহিল। আমি আনন্দভরে তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলাম,—"লতিফা! আমরা যেন এইরূপ প্রেমালিঙ্গনেই চিরাবদ্ধ হইয়া থাকি। বিচ্ছেদ যেন জীবনেও আমাদের মনের শান্তি নাশ না করিতে পারে।"

আমার হাতে যে বহুমূল্য অঙ্গুরীয় ছিল, তাহা খুলিয়া আমি লতিফার চম্পকাঙ্গুলীতে পরাইয়া দিলাম। হীরক-খানির উজ্জ্বল দীপ্তি দেখিয়া সে বড়ই আনন্দ লাভ করিল। তৎপরে মৃদুহাস্যের সহিত বলিল, "আজ আমি তোমায় একটু সকাল সকাল বিদায় দিব। তুমি বাটীতে ফিরিয়া গিয়া আমার উদ্ধারের উপায় চিন্তা কর গে। ঐ রজ্জুসোপান দিয়া আমরা

অতি সহজেই প্রাসাদের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারি। নদীর অপর পারে যাইবার জন্য, এক খানি নৌকা ঠিক করিও।”

আমি লতিফার এই কথা শুনিয়া, মনে একটা কল্পনাতীত সুখানুভব করিলাম। আশায় উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইলাম। মনে ভাবিলাম, কাল না হয় পরশু, এই সুন্দরী লতিফা আমার হইবে। লতিফার ক্ষুদ্র কক্ষ যেন বেহেস্তের উদ্যানের মত সুগন্ধপূর্ণ বলিয়া মনে হইল। কক্ষমধ্যস্থ আলোকগুলি যেন আরও দীপ্তিময় হইয়া জ্বলিতে লাগিল। প্রসূনবাস যেন আরও মধুগন্ধভরা হইয়া উঠিল। অসম্ভব যাহা, স্বপ্নের ব্যাপার যাহা, তাহা সত্যে পরিণত হইতে চলিল।

এ চিন্তায়—এ কল্পনায়—যে মহাসুখ। একটী রজনীতে ঠিক এই সময়ে আমার কলিজার কলিজা, প্রাণের প্রাণ, লতিফা বানু আমার আয়ত্ত মধ্যে আসিয়া পড়িবে। আমার দুর্ভাগ্যপীড়িত অদৃষ্টাকাশ চির দিনের জন্য সুখ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে!

কিন্তু হায়! মানুষে ত এ জীবনে অনেক সুখেরই কল্পনা করে। কিন্তু তাহাদের সকল আশা পূর্ণ হয় কি? পবিত্র প্রেমে চিরদিনই একটা অভিশাপ লাগিয়া আছে। এই চিন্তার পরমুহূর্ত্তে এমন একটী ঘটনা ঘটিল—যাহাতে আমার কল্পিত সুখের প্রাসাদ মুহূর্ত্তমধ্যে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধরাশায়ী হইল।

লতিফা ও আমি যখন মাধবী ও সহকারের মত, আলিঙ্গনসুখে আবদ্ধ হইয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছি, সেই সময়ে কে যেন আমাদের

কক্ষদ্বারে আঘাত করিয়া বলিল—"শীঘ্র দ্বার খোল লতিফা! আমি আসিয়াছি।"

লতিফা, সচকিতে আমার আলিঙ্গনপাশ হইতে মুক্ত হইয়া ব্যাধভয়ভীতা কুরঙ্গীর মত ভয়চকিত নেত্রে, বিকটদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"সুলতান! সুলতান! সর্ব্বনাশ উপস্থিত! কি হবে মনসুর?"

(১০)

"সুলতান" এই কথাটী বজ্রনির্ঘোষের মত আমার কাণে বাজিল। আমিও ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া বলিলাম—"ব্যাপার কি লতিফা?"

লতিফা কাঁপিতে কাঁপিতে অস্ফুটস্বরে বলিল—"আমরা জাহান্নমে গিয়াছি। স্বয়ং সুলতান আমার কক্ষদ্বারে উপস্থিত! কি করিয়া তোমার প্রাণ বাঁচাইব মনসুর? কি করিয়া আমি বাঁচিব! অতি শোচনীয় মৃত্যু আমাদের সম্মুখে! যাও তুমি ঐ পরদার পার্শ্বে গিয়া, এখনি আত্ম-গোপন কর।"

আমি বায়ুচালিত শরপত্রের মত কাঁপিতে কাঁপিতে, ত্বরিতগতিতে সেই পরদার অন্তরালে গিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাপ্লুত। নাসারন্ধ্র দিয়া যেন বিদ্যুৎ স্রোত বহিতে লাগিল।

লতিফা তখনই কক্ষদ্বার খুলিয়া দিয়া—দেখিল, সুলতান একা নহেন;

তাঁহার সঙ্গে চারিজন অস্ত্রধারী ভীষণ দর্শন হাব্‌সী খোজা! আর সুলতানের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ, কায়রোর শাসনকর্ত্তা মনসুর জঙ্গ!

লতিফা—সম্মানের সহিত সুলতানকে কুর্ণীশ করিয়া দূরে সরিয়া দাড়াইল!

সুলতান—কঠোর স্বরে বলিলেন—"শয়তানী! বিশ্বাসঘাতিনী! এই তোর কাজ? কাহার সঙ্গে তুই প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতেছিলি? কোথায় সেই হত্যভাগ্যকে লুকাইয়া রাখিয়াছিস্, এখনি আমার সম্মুখে হাজির করিয়া দে।"

লতিফা সাহস সঞ্চয় করিয়া, জোড়করে বলিল—"আজ এ বাঁদীর উপর এত নিগ্রহ কেন জাঁহাপনা? এত অবিশ্বাস কেন নরাধিপ? এই কথা বলিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে সে তখনই সুলতানের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

সুলতান, কঠোর স্বরে বলিলেন—"তোর নিগ্রহের সূচনা হইয়াছে মাত্র। শেষ হইতে অনেক বিলম্ব। বিশ্বাসঘাতিনীর দণ্ড কিরূপে দিতে হয়, তাহা এখনিই দেখিতে পাইবি? বল্ কোথায় তোর সেই গুপ্ত নায়ক, যে অপবিত্র কুক্কুরের মত, আমার এই প্রহরীবেষ্টিত হারেমের পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছে।

সুলতান—তখনই ভীম ভৈরবকণ্ঠে তাঁহার খোজা প্রহরীদের আদেশ করিলেন—"কক্ষের চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখ! আমি স্বকর্ণে এই কক্ষমধ্যে পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়াছি।"

প্রহরীগণ কিয়ৎক্ষণ অনুসন্ধানের পর, আমাকে সেই পরদার অন্তরাল হইতে টানিয়া বাহির করিল। আমায় সজোরে টানিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া সেই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মিশরাধিপের নিকট উপস্থিত করিল।

সুলতান—তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু—পার্শ্বচর কায়রোর শাসনকর্ত্তা, মনসুর জঙ্গকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—"তুমি এই মহানগরীর শাসনকর্ত্তা রূপে যে খুব কৃতিত্ব দেখাইতেছ, তাহার প্রমাণ পরাক্রান্ত সুলতানের হারেমে এই কুৎসিত প্রেমের ব্যাপার! যখন আমার অন্তঃপুরে, এই হতভাগ্য লম্পট, চোরের মত প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছে, সাহসী হইয়াছে, তখনই বুঝিয়াছি, তোমার শাসনশৃঙ্খলা অতি সুন্দর মনসুর!"

এই বিদ্রূপবাক্যে মনসুরের নেত্রদ্বয় বাঘের মত জ্বলিতে লাগিল। তিনি আমার দিকে এরূপ একটী রোষপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। সে কটাক্ষভঙ্গীতে আমি মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া উঠিলাম।

সুলতান আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"বল্ শয়তান! কোন সাহসে তুই আমার এ পবিত্র হারেম কলঙ্কিত করিলি?"

এ কথার ত কোন উত্তর দেওয়া চলে না। কি যে উত্তর দিব তাহাও বুদ্ধিতে কুলাইল না। :এ ক্ষেত্রে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেও কোন ফল হইবে না। মনে মনে ভাবিলাম—ব্যাপারটা যদি আমার জীবনের উপর দিয়াই শেষ হইয়া যায়, তাহাও শ্রেয়ঃ। আমার এ হতভাগ্য জীবনকে আহুতি দিলে যদি লতিফা বাঁচিয়া যায়—তাহাও আমার সৌভাগ্য।"

আমি যুক্তকরে নতজানু হইয়া বলিলাম, "শাহান্‌শা! এ ব্যাপারে

যদি কেহ দোষী থাকে, তা সে আমি। এই লতিফা বিবি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ দোষ মুক্ত। স্বীকার করিতেছি—আমি চোরের মত আপনার পবিত্র হারেমের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা কলঙ্কিত করিয়াছি। জাঁহাপনা! ন্যায়বিচারে আমার উপর যে দণ্ডব্যবস্থা করিবেন, আমি অবনত মস্তকে সানন্দ চিত্তে তাহা পালন করিতে প্রস্তুত।"

লতিফা এই সময়ে সুলতানের সম্মুখীন হইয়া যুক্ত করে বলিল—"জাঁহাপনা! এই যুবক আমার জীবন রক্ষার জন্য মিথ্যা কথা বলিতেছে। আমার দোষ সে নিজের স্কন্ধে লইতেছে। এ ব্যাপারে যে আমিই দোষী তাহার প্রমাণ—এই অঙ্গুরীয়। আর আমার প্রকোষ্ঠের বাহিরের জানালায় যে রজ্জুসোপান লাগান আছে, তাহাই আমার কৃতাপরাধের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।"

সুলতান তাঁহার একজন অনুচরকে আদেশ করিবামাত্র, সে তখনই সেই রজ্জু-সোপানটা খুলিয়া লইয়া আসিল। ইহাই লতিফার বিরুদ্ধে প্রধান প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইল।

সুলতান—আমাকে লতিফার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন। আমি সভয় চিত্তে তখনই তাঁহার আদেশ পালন করিলাম।

সুলতান বজ্রনির্ঘোষে বলিলেন—"এই কক্ষ এখনিই তোদের দুজনের হৃদয়ের শোণিতে রঞ্জিত হইবে। যে হৃদয় বিনিময় করিয়া তোরা সুখের প্রত্যাশা করিতেছিলি, তাহা এখনই শাণিত অস্ত্রে দ্বিখণ্ডিত হইবে। তোদের মৃতদেহ শৃগাল কুক্কুরের ভোজ্যে পরিণত হইবে। তোদের এই

জীবনান্তকাল পূর্ব্বে একবার সেই মহিমময় খোদাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া নে।”

দুই চারি মুহূর্ত্ত এইভাবে কাটিল। সুলতান বলিলেন—“শয়তানী লতিফা! তোকে বাঁদিরূপে ক্রয় করিয়া, আমি রাজরাণীর উচ্চাসন সম্মান ও অধিকার দিয়াছিলাম। তুই যে এতটা বিশ্বাসঘাতিনী, হীন-চরিত্রা, তাহা জানিলে আমি তোকে একটুও প্রশ্রয় দিতাম না। যাহাকে তুই ভাল বাসিয়াছিস্, যাহার সহিত হৃদয় বিনিময় করিয়া তুই বিশ্বাস-ঘাতিনী হইয়াছিস্, তোর সেই প্রিয়তম এই নরাধমকে তোর সম্মুখে আমি হত্যা করিব। একটু আগে মিলনের আনন্দে তুই যেরূপ সুখসম্ভোগ করিয়াছিলি, ইহার শোণিতাক্ত ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া, তদতিরিক্ত নারকীয় আনন্দে অভিভূত হইবি।”

এই কথা বলিয়া সুলতান তাঁহার কোষনিবদ্ধ শাণিত তরবারি আকর্ষণ করিলেন। প্রদীপ্ত দীপালোকে সে তরবারি ঝকমক্ করিয়া উঠিল। আমি সভয়ে চক্ষু মুদিলাম। শোচনীয় মৃত্যু—তখন আমার সম্মুখে! মনে মনে খোদাকে ডাকিয়া, পরপারে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

এই উত্তেজনাময় সাংঘাতিক মুহূর্ত্তে—কায়রোর শাসনকর্ত্তা অর্থাৎ আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুলতানের হাতখানি ধরিয়া ফেলিলেন। বিনয়নম্র-বচনে বলিলেন—“জাঁহাপনা! এই শয়তান ও শয়তানীর হৃদয়ের শোণিতে আপনার পবিত্র অসি কলঙ্কিত হয়, আপনার এ রংমহল কলঙ্কিত শোণিত-ময় হয় আমার তাহা ইচ্ছা নয়। শিরচ্ছেদ হইয়া গেলেই ত ইহাদের

সকল জ্বালার অবসান হইবে। তাহা হইলে ইহাদের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল কই জাঁহাপনা ?”

সুলতান বলিলেন—“তাহা হইলে কি করিতে বল তুমি সমশের ?”

কায়রোর শাসনকর্ত্তা সমশের জঙ্গ বলিলেন—“আমার অভিপ্রায় উহাদের দুইজনকেই দুইটী পুরু চর্ম্ম থলিয়ায় আবদ্ধ করিয়া, প্রাসাদের উপর হইতে নীল নদে ফেলিয়া দেওয়া হউক। উহাদের কলঙ্কিত দেহ জল জীবের আহার্য্যে পরিণত হউক। রজনী প্রভাতের পূর্ব্বে আপনার চোখের সম্মুখে, যাহাতে এ কাজটা শেষ হইয়া যায়, তাহার আদেশ করুন।”

সুলতান—তাঁহার বন্ধুর এই পরামর্শই গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আদেশ প্রাপ্তিমাত্রেই খোজারা তথনই দুইটী উষ্ট্রচর্ম্ম নির্ম্মিত সুবৃহৎ থলিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিল।

আমাদের দুইজনকে সেই থলিয়ার মধ্যে বল পূর্ব্বক প্রবেশ করাইয়া দিয়া, সেই ভীমকায় রক্ষীরা, থলিয়া দুটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি বাঁধিয়া ফেলিল।

সুলতান কঠোরস্বরে বলিলেন—“যে আমার প্রেমপাত্রীকে এই ভাবে কলুষিত করিতে সাহস করে, হারেমের শুচিভাবের উপর কলঙ্ক আনিতে সাহস হয়, তাহাদের এইরূপ কঠোর শাস্তিই হইয়া থাকে।”

এই কথা বলিয়া সুলতান বজ্রগম্ভীরস্বরে আদেশ করিলেন—“এই থলিয়া এথনই পূর্ব্বদিকের ছাদে লইয়া যা। সেই ছাদের নিম্নেই নীলনদের স্রোত বেশী বেগবান। আমি এথনই সেথানে যাইতেছি।”

প্রহরীরা আমাদের দুইজনের আবদ্ধ দেহ স্কন্ধে করিয়া, তখনই সেই ছাদে আনিয়া নামাইল। সুলতান ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী কায়রোর শাসনকর্ত্তা সমসের জঙ্গ, আমাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইহার পরক্ষণেই, সুলতান আমাদের দেহ নদীর জলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন।

বলা বাহুল্য, সুলতানের এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা তখনই প্রতিপালিত:হইল। আমাদের দুইজনের দেহই বিশাল স্রোত তরঙ্গে ডুবিয়া গেল।

(১১)

নীলনদের প্রবল স্রোত আমাকে যে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ক্রমশঃ শ্বাসরোধের অবস্থা উপস্থিত হইল। দুর্ভাগ্য আমার চিরসঙ্গী। জীবনে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, এজন্য মৃত্যুর কবলস্থ হইয়াও ঘটনাচক্রে পড়িয়া আমি বাঁচিয়া গেলাম।

যে চর্ম্ম থলিয়ার মধ্যে তাহারা আমায় আবদ্ধ করিয়া নদীগর্ভে ফেলিয়া দিয়াছিল—জীবন রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া সেই থলিয়ার মুখের বাঁধনটা অনেক কষ্টের পর খুলিয়া ফেলিলাম। থলিয়াটি এই সময়ে এক জলনিমজ্জিত পাষাণ-স্তূপে গিয়া আটকাইল। আমি সেই নিমজ্জিত প্রস্তর খণ্ড সহায়তায় একটু আশ্রয়স্থান করিয়া লইলাম। তৎপরে বাঁধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বাধীনভাবে সন্তরণ করিয়া নদীর অপর পারে উত্তীর্ণ হইলাম।

সফল-স্বপ্ন

নীলনদের অপর তীরে একটি ক্ষুদ্র বন্দর। এই বন্দরের কতকটা অংশ খুব বড় বড় চৌকা পাথরে বাঁধানো। আমি কিয়ৎকাল, সেই সুপ্রশস্ত প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া একটু দম লইলাম। তখনই আমার অন্তরের অন্তর হইতে, কে যেন বলিয়া উঠিল, লতিফারও তোমার মত অবস্থা হইয়াছে। হয় ত সে এতক্ষণ প্রবল নদস্রোতে হাবুডুবু খাইয়া জীবনরক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে।

ভাবিলাম, আমার জন্যই ত লতিফার এই কষ্ট, এই শোচনীয় পরিণাম! আমার মত নষ্টভাগ্য লোক যদি তাহার সঙ্গে না মিলিত হইত, তাহাকে ভাল না বাসিত, তাহা হইলে সে হয় ত আজ রাজরাণী রূপে সুলতানের প্রাসাদে বিরাজ করিত।

তখনই দিক্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া উন্মাদের মত, আমি আবার সেই তরঙ্গময় নদীবক্ষে ঝাঁপ দিলাম। প্রবল স্রোতের সহিত যুঝিতে যুঝিতে বিপরীত দিকে ভাসিয়া চলিলাম।

বহুক্ষণ এই ভাবে সন্তরণ করিয়া বুঝিলাম, আমার পরিশ্রম বিফল হইয়াছে। নদীগর্ভের অন্ধকারটা মেঘঢাকা চাঁদের জ্যোতিতে, যেন আরও তমসাচ্ছন্ন হইতেছে। আমি সন্তরণ কালে উভয় পার্শ্বেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। কিন্তু কোন কিছুই আমার চোখে পড়িল না।

মনে ভাবিলাম, নীলনদের প্রবল স্রোত-তরঙ্গে নিমজ্জিতা হইয়া আমার প্রাণাধিকা লতিফুন্নিসা হয় ত এতক্ষণে জন্মের মত সলিল-সমাধি

লাভ করিয়াছে। এই মস্তিষ্ক প্রদাহী চিন্তা, আমার প্রাণের মধ্যে বিষের জ্বালা উৎপাদন করিল।

স্রোতের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে, আমার হস্তপদের চালনাশক্তি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিল। মনে ভাবিলাম, আর কিয়দ্দূর এইভাবে অগ্রসর হইলে হয় ত আমার লতিফার মত সলিলসমাধি হইবে।

এই সময়ে কে যেন, আমার হৃদয়ের অন্তঃস্তল হইতে পুনরায় বলিল, "হতভাগ্য! তুমি যে উপায়ে বাঁচিয়া গিয়াছ, তোমার লতিফাও ত সেই উপায়ে বাঁচিতে পারে। খোদা সহায় থাকিলে সবই সম্ভব হয়। তুমি মুর্খের মত, তোমার জীবনকে এ ভাবে অনর্থক বিপন্ন করিও না।"

এই বিবেকবাণীর জাগরণে আমার চৈতন্য হইল। মনে একটা বিশ্বাস জন্মিল, লতিফা হয় ত কোন দৈবপ্রেরিত উপায়ে এ যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছে। চেষ্টা করিলে, আমি তাহাকে আবার হয়তো খুঁজিয়া লইতে পারিব।"

আশার এই মোহিনী ছলনায় মুগ্ধ হইয়া, আমি পুনরায় সন্তরণ দ্বারা তীরে উঠিলাম। আর্দ্র বস্ত্রে, নগ্নপদে, নদীর পার্শ্ববর্ত্তী পথে চলিতে লাগিলাম। কোথায় যাইতেছি, কেন যাইতেছি, তাহাও জানি না। সেই মেঘঢাকা বিরল জ্যোৎস্নায় আমার দুই চক্ষু আমাকে যে দিকে লইয়া যাইতেছিল, আমি সেই দিকেই অগ্রসর হইতেছিলাম।

এই ভাবে প্রায় ক্রমাগত চারি পাঁচ ঘণ্টা পথ চলিবার পর, এক পাহাড়ের সানুদেশবর্ত্তী ক্ষুদ্র সহরে উপস্থিত হইলাম। এ সহরের নাম

কি তা জানিনা। তবে এইটুকু মনে ভাবিলাম, এটি যখন জনপূর্ণ সহর তখন কোন না কোন স্থানে আশ্রয় পাইতে পারিব।

কিন্তু রজনী প্রভাতা না হইলে, সহরের মধ্যে প্রবেশ করিবার কোন উপায় যে নাই। কেননা সেই ক্ষুদ্র সহরের চারি দিক, প্রস্তর-প্রাচীর দিয়া ঘেরা।

সেই ক্ষুদ্র পাহাড়ের সানুদেশে, এক বিরল জঙ্গল। অগত্যা আমি সেই জঙ্গলের প্রবেশপথে একটী বৃক্ষতলে শয়ন করিলাম। শয়ন করিবা-মাত্রই তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম।

স্বপ্নে দেখিলাম, আমার প্রিয়তমা লতিফা যেন আমার সেই উপল-মণ্ডিত শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিতেছে—"ভয় নাই তোমার মনসুর; আমি মরি নাই। আবার তুমি আমাকে পাইবে।"

(১২)

সহসা আমার সেই স্বপ্নময় নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। আমি চমকিয়া উঠিয়া সেই বৃক্ষের গায়ে ঠেস্ দিয়া বসিয়া, চারি দিকে দেখিতে লাগিলাম। সহসা এই সময়ে, রমণীকণ্ঠস্বরে কে যেন সেই বনান্তরাল হইতে কঠোর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তারপর আর কোন কিছুই শুনিতে পাইলাম না।

আমি ভাবিলাম, হয়তো আমার শুনিতে ভ্রম হইয়াছে। তাহা হইলেও নিশ্চিন্ত না থাকিয়া যে দিক হইতে সেই আর্ত্তনাদ আসিয়াছিল, সেই দিক লক্ষ্য করিয়া জঙ্গল ভাঙ্গিয়া অতি কষ্টে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

যাহা দেখিলাম, তাহাতে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে হইল। সবিস্ময়ে দেখিলাম, সেখানে কোন রমণীই উপস্থিত নাই। কেবল মাত্র একজন লোক, অতি ক্ষিপ্রহস্তে একটা ক্ষুদ্র খাতের মত স্থান মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিতেছে।

মনে ভাবিলাম, লোকটা হয় নরঘাতক না হয় দস্যু। হয় ত সে কাহাকে হত্যা করিয়া সেই খাদের মধ্যে পুঁতিতেছে, না হয় কোনও হতভাগ্য কৃপণের গুপ্তধন অপহরণ করিয়া, তাহা ভূগর্ভে নিহিত করিয়া রাখিতেছে। এ সময়ে সহসা তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেই, সে নিশ্চয়ই মরিয়া হইয়া আমায় আক্রমণ করিবে। আর আমার শরীরের এ অবস্থায় আমিও তাহার সহিত তিলমাত্র যুঝিতে পারিব না। সুতরাং নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া, তাহার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। সেই খনিত স্থান মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া, লোকটা এক জ্বলন্ত মশালহস্তে সহরের দিকে চলিয়া গেল। সে চক্ষুর অন্তরাল হইলে, আমি তিলমাত্র সময়ক্ষেপ না করিয়া, সেই ভরাট করা খাদের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাড়াতাড়ি উপরের মৃত্তিকা গুলি সরাইবা মাত্র যে বিভীষিকাময় দৃশ্য আমার নেত্রপথবর্ত্তী হইল, তাহা অতি ভীষণ! অতি ভয়াবহ!

দেখিলাম, সেই খনিত ক্ষুদ্র খাতের মধ্যে, এক যুবতীর শোণিতাক্ত দেহ। খুব তাড়াতাড়ি সেই দেহ ও তদুপরিস্থ মৃত্তিকা সরাইয়া তাহা গর্ত্ত হইতে তুলিয়া ফেলিলাম।

পরীক্ষায় বুঝিলাম, তখনও সে দেহে প্রাণবায়ু বিদ্যমান। ভূপ্রোথিত রমণীর, সুন্দর রূপপ্রভা ও বহুমূল্য বসন-ভূষণ দেখিয়া বুঝিলাম, সে নিশ্চয়ই কোন সম্ভ্রান্ত কুলকামিনী। দস্যুবৃত্তি যে এই হত্যার উদ্দেশ্য, তাহা নয়। কেননা, তাহার অঙ্গুরীয়ক ও কণ্ঠদেশের মণিখচিত হার, প্রকোষ্ঠের রত্নবলয়, তখনও স্থানচ্যুত হয় নাই। আমি মৃত্তিকা গুলি সযত্নে ঝাড়িয়া দিয়া, অস্ফুট চীৎকারের সহিত বলিয়া উঠিলাম—"ইয়ে! মেহেরবান্ খোদা! তোমার দুনিয়ায় এমন শয়তানও আছে, যে এরূপ নিষ্ঠুর ভাবে রমণী হত্যা করিতে পারে?"

আমার কথাগুলি বোধ হয়, তাহার কাণে প্রবেশ করিল। সে বলিল—"মুসলমান! তুমি যেই হওনা কেন, একটু জল দিয়া আগে আমার জীবন রক্ষা কর। যদি সেই খোদার উপর তোমার প্রকৃত ভক্তি থাকে, তাহা হইলে তাঁহার দোহাই, যেখান হইতে পার আমায় একটু শীতল পানীয় আনিয়া দাও। তৃষ্ণায় আমার প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছে।"

আমি পূর্ব্বোক্ত জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিবার সময়, এক ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছিলাম। এ নির্ঝরটী ঘটনাস্থলের খুব কাছে। আমি তাহাকে বলিলাম—"ভদ্রে! কোন ভয় নাই তোমার। খোদা তোমার সহায়। আমি এখনই জল আনিতেছি।"

নির্ঝর সমীপে উপস্থিত হইয়া, আমার উষ্ণীষ ভিজাইয়া, যথেষ্ট বারি সংগ্রহ করিয়া, আবার সেইস্থানে ফিরিয়া আসিলাম। উষ্ণীষ নিঙ্গড়াইয়া তাহাকে তৃষ্ণার জল দিলাম। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

সেই রমণী বলিল—"সাহেব! তুমি আজ আমার জীবন দান করিলে। আমার শরীরের দুই তিন স্থানে, সেই শয়তান অস্ত্রাঘাত করিয়াছে বটে, কিন্তু আমার বোধ হয় সে আঘাত ততটা সাংঘাতিক নয়। আমাকে তুমি কোন সরাইখানায় লইয়া চল। আমি এক সম্রান্ত কুলোদ্ভবা কুলকামিনী। ঘটনাচক্রে এক পাষণ্ডের হাতে পড়িয়া, আজ আমার শোচনীয় মৃত্যু ঘটিতেছিল। আমার উপকার করিলে, খোদা তোমার মঙ্গল করিবেন। আর এজন্য তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ হইয়া থাকিব।"

আমি আমার উষ্ণীষ বস্ত্র ছিন্ন করিয়া, তাহার শোণিতাক্ত ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিলাম। তাহাতে শোণিতস্রাব অনেকটা বন্ধ হইল।

সেই রমণী বলিল—"হে সদাশয় মুসাফের! তুমি যে করুণাবশে আজ আমার জীবনরক্ষা করিলে, সেই করুণাচালিত হইয়া যত শীঘ্র পার আমায় সহরের মধ্যে লইয়া চল। ঊষাকাল সমাগতপ্রায়। এতক্ষণে হয়ত এই প্রস্তরপ্রাচীরবেষ্টিত সহরের প্রবেশদ্বার খুলিয়াছে। সহরের প্রবেশ দ্বারের নিকট পৌঁছিতে পারিলেই, তুমি উটের গাড়ী বা বয়েল পাইবে।"

আমি এই বিপন্না রমণীর কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। এই সময়ে লতিফার কথা আমার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিল। আমি সেই রমণীকে বলিলাম, "ভদ্রে! এ ক্ষুদ্র সহরটী আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তোমায় কোথায় পৌছাইয়া দিতে হইবে বলিয়া দাও।"

সেই রমণী বলিল—"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে আমি কোন সম্রান্ত

কুলমহিলা। এর পরে তুমি আমার পূর্ণ পরিচয় পাইবে। এখন আমি আমার বাটীতে যাইব না। এই সহরে অনেক ভাল ভাল সরাইখানা আছে। বর্ত্তমানে আমার চিকিৎসার প্রয়োজন। ক্ষতস্থানের শোণিতস্রাব বন্ধ না করিলে, আমি প্রাণে বাঁচিব না। কোন সরাইখানায় থাকিয়া আমার চিকিৎসা চলিতে পারে। তার পর আমি বাড়ীতে যাইব!”

আমি তাহার উদ্দেশ্য কি, তাহা ভালরূপে বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম—“ভদ্রে! যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি আমার কে, তখন আমি কি বলিয়া পরিচয় দিব? কারণ—এক আহত যুবতীকে লইয়া উষার প্রারম্ভেই কোন সরাই মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। আর কেহ প্রশ্ন না করে সরাইরক্ষকও একটা কৌতূহলবশে, আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারে। তাহার কি জবাব দিব বলিয়া দাও?”

সেই রমণী বলিল—“তুমি বলিবে, যে আমি তোমার সহোদরা ভগ্নী। পথিমধ্যে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায়, আমাদের এই দশা ঘটিয়াছে। খরচ পত্রের জন্য তোমার কোন ভাবনা নাই। আমার হাতের একটী অঙ্গুরী বেচিলে আমার চিকিৎসার ব্যয়, সরাইএর খরচ, সবই স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইবে। এ সহরে দুইমাস থাকিলেও অর্থের অনাটন হইবে না।”

আমি উপায়ান্তর বিহীন হইয়া, সেই বিপন্না রমণীকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া পূর্ব্বোক্ত জঙ্গল পার হইলাম। এই সময়ে আমার সৌভাগ্যক্রমে, একখানি বয়েল—গাড়ি পথিমধ্যে দেখিতে পাইয়া গাড়োয়ানের সহিত দ্বিগুণ ভাড়া চুক্তি করিয়া, সেই বিপন্না রমণীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া, আমি তাহার

পার্শ্বে বসিলাম। সে সেই গাড়ীর গদীর উপর শুইয়া পড়িল। দেখিলাম, তখনও তাহার ক্ষত হইতে শোণিতস্রাব হইতেছে।

যথা সময়ে সেই শকটচালক, আমাদের এক প্রথম শ্রেণীর সরাই খানার দ্বারদেশে পৌঁছাইয়া দিল। সেই রমণী তাহার আঙ্গরাখার মধ্য হইতে, একটী ক্ষুদ্র রেশমী থলিয়া বাহির করিয়া বলিল, ইহার মধ্যে পঁচিশটী স্বর্ণমুদ্রা আছে। ইহাতে আমাদের উপস্থিত খরচপত্র চলিয়া যাইবে। তুমি ইহা রাখিয়া দাও।"

আমি সরাই-রক্ষকের সহায়তায়, সেই আহতা রমণীকে একটী নির্জ্জন কক্ষমধ্যে লইয়া গেলাম। এই কক্ষটী ভদ্রোচিত ধরণে সুসজ্জিত। তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া, আমি সরাই-রক্ষককে বলিলাম—"ইনি আমার সহোদরা। পথিমধ্যে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায়, ইঁহার এই দশা ঘটিয়াছে। আপনি এই দুইটী স্বর্ণমুদ্রা লউন, বড়ই শোণিতস্রাব হইতেছে তাহা এখনি বন্ধ করা চাই। আপনি শীঘ্র একজন হাকিম ডাকিয়া লইয়া আসুন।"

অর্থবলে কি না হয়? সরাই-রক্ষক তখনই একজন ক্ষত চিকিৎসককে সঙ্গে লইয়া আসিল। চিকিৎসক, আঘাতচিহ্ন বিশেষ রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন—"সাংঘাতিক না হইলেও ইহা সারিতে একটী মাস সময় লাগিবে।"

কোথাকার ঘটনা কোথায় গিয়া দাঁড়ায়! আমি একে নিজের জ্বালায় অস্থির, কোথায় লতিফার সংবাদ লইব, তাহাকে চারিদিকে খুঁজিব, তাহা

না হইয়া আর এক নূতন বিপদে আমায় জড়িত হইতে হইল। এই বিপন্না রমণী যখন আমাকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করিয়াছে, আমি তাহাকে ভগ্নী সম্বোধনে অভয় দিয়াছি, তখন যে উপায়ে হৌক, ইহাকে আবার পূর্ব্বাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহার প্রাণ বাঁচাইতে হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই—আমার এই ভগিনীটী, কোনমতেই তাহার প্রকৃত পরিচয় দিতে স্বীকৃত নহে। তাহার চালচলন অতি কেতা দুরস্ত—কথাবার্ত্তা অতি সুরুচিসঙ্গত, আমার প্রতি সে যথেষ্ট স্নেহ দেখাইতেছে, তবুও আমি তার পরিচয় পাইলাম না।

সে যে এক অবস্থাপন্ন লোকের কন্যা বা ঘরণী, তাহা তাহার হস্তের দুইটী বহুমূল্য অঙ্গুরীয় হইতেই বুঝিয়াছিলাম।

আমি যখন একটু অবসর পাই, তখনই লতিফার সংবাদ সংগ্রহের জন্য সহরের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াই। কিন্তু কোন সংবাদই সংগ্রহ করিতে না পারিয়া হতাশ হৃদয়ে, অবসন্ন মনে, সরাই খানায় ফিরিয়া আসি। আমার মনের অবস্থা তখন অতি শোচনীয় হয়।

দেখিতে দেখিতে একটী মাস কাটিয়া গেল। আমি সেই রমণীকে একদিন উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া বলিলাম—"ভগ্নি! কোন জরুর প্রয়োজনে আমায় বোধ হয় শীঘ্রই এ সহর ত্যাগ করিতে হইবে?"

সে বলিল—"কবে তুমি যাইতে ইচ্ছা কর।"

আমি বলিলাম—"তোমাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়াই এই স্থান ত্যাগ করিব।"

(১৩)

এই রমণীর নাম জুলেখা। জুলেখা যুবতী ও পরমা সুন্দরী। পরিচয়ের মধ্যে কেবল তাহার নামটীই আমি জানিতে পারিয়াছিলাম। আর এটা তাহার প্রকৃত নাম কিনা, তাহা বলিতে পারি না।

জুলেখা মনে মনে কি ভাবিল। তারপর বলিল—"ভাই! তোমার সহিত বিচ্ছিন্ন হইতে আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে। তুমি আমায় এ বিপন্ন অবস্থায় সহোদরের অধিক উপকার করিয়াছ। এ কৃতজ্ঞতার ঋণ আমি জীবনে শোধ করিতে পারিব না। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে আমার বড়ই কষ্ট হইবে। যাহাই হউক, যখন তুমি ব্যস্ত হইয়াছ, তখন আরও দুই সপ্তাহ কাল এখানে অপেক্ষা কর। আমি আরও একটু সুস্থ হইয়া উঠি। তারপর তোমার অভীপ্সিত স্থানে চলিয়া যাইও। দোহাই আল্লার! এ বিপন্ন অবস্থায় আমায় ছাড়িয়া যাইও না।"

আমি তাহার এ কাতর প্রস্তাবে অসম্মত হইতে পারিলাম না। বলিলাম—"ভাল তাহাই হইবে।"

জুলেখা বলিল—"তুমি চেষ্টা করিয়া এই সরাইখানা হইতে একটা দোয়াত কলম ও কাগজ আনাইতে পার?"

আমি সরাই-রক্ষকের নিকট হইতে তাহার প্রার্থিত জিনিসগুলি আনিয়া দিলে, সে সেই কাগজে কয়েকটী সাঙ্কেতিক কথা লিখিয়া আমার হাতে দিয়া বলিল—"এই সহরের মহাজন পটীতে শেয়াখত খাঁ বলিয়া এক-

জন নামজাদা রত্ন-ব্যবসায়ী আছেন। তাঁহার নাম করিলেই লোকে তোমাকে তাঁহার গদি দেখাইয়া দিবে। তুমি তাঁহার হাতে এই পত্রখানি দিবামাত্রই, তিনি তোমাকে এক স্বর্ণমুদ্রা পূর্ণ থলিয়া দিবেন। তাহা লইয়া এখানে চলিয়া আসিও। তাহার সহিত অন্য কোন কথাবার্ত্তার প্রয়োজন নাই। আমার এখন টাকার বড়ই প্রয়োজন।"

আমি তখনই পত্রখানি লইয়া বাজারের দিকে চলিলাম। মহাজনের নাম বলিবা মাত্র, লোকে আমাকে তাহার গদী দেখাইয়া দিল।

পত্রখানি পাঠ করিয়া সেই রত্ন-বণিক, আমাকে যথেষ্ট সমাদরের সহিত তাঁহার পার্শ্বে বসাইলেন। তাম্বুল ও আতর দিয়া আমার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। পত্রখানি দুই তিনবার পাঠ করিয়া, ভক্তির সহিত তাহা চুম্বন করিলেন ও মস্তকে রাখিলেন। বুঝিলাম, এই পত্রলেখিকা জুলেখা তাঁহার চক্ষে অতি সম্মানিতা।

যাহা হউক, এই রত্ন-বণিক তখনই দুইটী স্বর্ণমুদ্রার ক্ষুদ্র থলিয়া আমার হাতে দিলেন। আর বলিলেন—"তাঁহাকে আমার সেলাম জানাইয়া এই মুদ্রাগুলি দিবেন।"

ব্যাপারটা আমার মনে একটা ভীষণ কৌতূহলের উদ্রেক করিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে এই মহাজন কিম্বা জুলেখা কাহাকেও প্রশ্ন করিলে কোনও সদুত্তর পাইব না ভাবিয়া, আমি আমার কৌতূহল দমন করিলাম। বাড়ীতে ফিরিয়া জুলেখার হাতে মুদ্রাপূর্ণ থলিয়া দুটী দিলাম।

জুলেখা সহাস্যমুখে বলিল—"ভাই, এই সামান্য ব্যাপারে তোমাকে

অনর্থক কষ্ট দিলাম, এজন্য মনে কিছু করিও না। তুমি যখন এখান হইতে চলিয়া যাইবে, তাহার পূর্ব্বেই তুমি আমার প্রকৃত পরিচয় পাইবে। অন্ততঃ সাত দিনের জন্য তুমি তোমার কৌতূহলটা দমন করিয়া রাখ। আর একটা কথা। এতদিন অর্থাভাবেই আমাদের এই সরাইখানায় থাকিতে হইয়াছে। আমার ইচ্ছা, আজই তুমি এই সহরের কোন নিভৃত স্থানে, ভদ্রলোকের ব্যবহারোপযোগী একটী বাড়ী ভাড়া কর।"

জুলেখার ইচ্ছানুসারে, আমি সহরের মধ্যে ঘুরিয়া, ঘণ্টাখানেকের ভিতর একটী বাড়ী স্থির করিলাম। এখানকার সকল ভাড়াটিয়া বাড়ীই সজ্জিতাবস্থায় থাকে। তবে ভাড়া খুব বেশী।

আমরা সেই নূতন বাড়ীতে উঠিয়া গেলাম। এই বাড়ীতে উঠিয়া আসিবার দ্বিতীয় দিনে, জুলেখা সেই রত্ন-বণিকের নামে আর একখানি পত্র দিয়া আমায় পুনরায় তাহার গদিতে পাঠাইল।

মহাজন, পত্র পাইবামাত্র দ্বিতীয় দিনেও আমায় চারিটী থলিয়াপূর্ণ মুদ্রা দিল। এই মুদ্রার সহায়তায় পরদিনে আমি জুলেখার ইচ্ছানুসারে, কিছু বহুমূল্য পোষাক ও চারিজন সুন্দরী বাঁদি ক্রয় করিয়া আনিলাম।

জুলেখা আমাকে বলিল—"ভাই আমি যাহা করিয়া যাইব, তাহাই এখন তুমি দেখিয়া যাও। এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই আমাকে করিও না। তোমায় যাহা করিতে বলিব, বিনা আপত্তিতে তাহাই সম্পন্ন করিও। আমি যেমন এ পর্য্যন্ত তোমার বিশেষ পরিচয় সম্বন্ধে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করি নাই, তুমিও আমার সম্বন্ধে সেইরূপ নির্ব্বাক থাকিও। তোমার নিকট

হইতে আমার আরও একটু সাহায্য পাওয়া প্রয়োজন। তোমার স্বভাব-সিদ্ধ করুণাবশে, যখন তুমি আমার এতটা উপকার করিয়া আসিয়াছ, তখন আরও একটু করুণা দেখাইতে হইবে।"

অনেক সময়ে আমার ইচ্ছা হইত, তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করি, "কে তোমাকে ওরূপভাবে আহত করিল? কে তোমাকে ওরূপ নিষ্ঠুর ভাবে জীবন্ত অবস্থায় কবর দিয়া গেল?" কিন্তু নানাদিক ভাবিয়া এ সংকল্প হইতে বিরত হইলাম।

নিত্য নূতন সজ্জা ক্রয়ে আমাদের সেই ভাড়াটিয়া বাড়ীটী যেন নিজের বাড়ীর মত সুসজ্জিত করিয়া ফেলিয়াছি। বাঁদী-চাকর, গৃহসজ্জা কিছুরই অভাব নাই। পল্লীর সকলেই জানিল, আমরা ভ্রাতা ও ভগ্নী। অবস্থা সম্পন্ন আমীর লোকের ঘরানা।

একদিন জুলেখা আমায় বলিল—"ভাই! আমার নিজের ও তোমার পোষাকের জন্য, কয়েক থান রেশমী কাপড়ের প্রয়োজন। তুমি এই স্বর্ণ মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটি লইয়া বাজারে যাও। ইহাতে পাঁচ শত মুদ্রা আছে। এই সহরের চকের মধ্যে নামরান খাঁ বলিয়া একজন বিখ্যাত রেশমী কাপড়ের সওদাগর আছেন। তাঁহার নিকট হইতে তুমি কয়েকটী থান খরিদ করিয়া আনিবে। অন্য দোকানে যাইও না। কিম্বা নামরাণের সহিত দরদস্তুর করিও না। খরিদাবস্ত্রের মূল্য তিনি যাহা চাহিবেন, বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাকে তাহাই দিয়া আসিবে।"

আমি চকের মধ্যে গিয়া, এই প্রসিদ্ধ রেশম ব্যবসায়ী নামরান খাঁর

সন্ধান করিলাম। তাঁহার দোকানের সাজসজ্জা দেখিয়া বোধ হইল, লোকটা অনেক টাকায় কারবার করে। খুব একজন ধনী মহাজন।

দেখিলাম নামরান একজন যুবা পুরুষ। দেখিতে অতি সুন্দর। তৈলসিক্ত কুঞ্চিত কেশগুলি, তাহার সুন্দর মুখের শোভা যেন আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। তাহার প্রত্যেক আঙ্গুলে এক একটী বহুমূল্য অঙ্গুরীয়। চালচলনে, কথাবার্ত্তায় লোকটা বেশ মার্জ্জিতরুচি।

নামরান আমায় দেখিয়া তটস্থ হইল। সেদিন আমি জুলেখার উপদেশে, শকটারোহণে গিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে একজন বাঁদীও ছিল।

আমি দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র, সে আমাকে খুব খাতির তোয়াজ করিয়া কাছে বসাইল। বলিল—"কি চাই আপনার ?"

আমি বলিলাম—"কয়েক স্যুট পোষাকের জন্য অতি উৎকৃষ্ট রেশমের থান চাই। দামের জন্য আটকাইবে না। জিনিস যেন খুব ভাল হয়।"

নামরান ভৃত্যদের নানারকমের চিত্রিত রেশমী থান আনিতে হুকুম করিল। বাছিয়া বাছিয়া এমন সুন্দর কাপড় তাহারা বাহির করিল, যে সেগুলি দেখিলেই লইতে ইচ্ছা করে। আমি জুলেখার উপদেশমত কোনরূপ দরদস্তুর না করিয়া তাহার প্রার্থিত মূল্য দিয়া দিলাম।

নামরান বুঝিল—সে একজন আমীরগোছের খরিদদার পাইয়াছে। এজন্য বলিল—"হুজুরের যখন যা কিছু প্রয়োজন হইবে, আমার দোকানেই দয়া করিয়া আসিবেন।"

বাড়ীতে গিয়া জুলেখাকে সেই রেশমের থানগুলি দিলাম। নামরানের সহিত আমার যা কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, শুনিয়া সে বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করিল। বলা বাহুল্য, থানগুলিও সঙ্গে সঙ্গে পোষাকে পরিবর্ত্তিত হইবার জন্য দর্জ্জীর বাড়ী চলিয়া গেল।

ইহার দুই দিন পরে, জুলেখা আমার হাতে একটা স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ ক্ষুদ্র থলিয়া দিয়া বলিল—"ভাই! আজ আবার তোমাকে সেই নামরানের দোকানে যাইতে হইবে। দরদস্তুর ত দূরের কথা। জিনিসগুলি লইয়া, তুমি তোমার স্বর্ণমুদ্রার থলিয়াটি তাহার হাতে দিয়া বলিও—"তোমার জিনিসের মূল্য যা হয়, তাহা ইহা হইতে বাহির করিয়া লও।"

আমি এই নামরানের দোকানে জিনিস পত্র ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারে বুঝিতে পারিলাম, জুলেখা কোন একটা গভীর উদ্দেশ্য মনোমধ্যে পোষণ করিয়া, এই সব কেনাবেচা করিতেছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাকে সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ করিয়াছিল। এজন্য আমি এবারেও এই অদম্য কৌতূহল দমন করিয়া রাখিলাম।

নামরানের দোকানে যাইবামাত্র, সে আমাকে খুব খাতির করিয়া বসাইল। আমি তাহাকে কতকগুলি রেশমী বস্ত্র দেখাইতে বলিলাম। তখনই আমার :আদেশ পালিত হইল। আমি জুলেখার উপদেশে স্বর্ণ মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটি, তাহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিলাম—"দোস্ত! তোমার দ্রব্যের মূল্য তুমি এই থলিয়া হইতে বাহির করিয়া লও।"

আমার হৃদয়ের এই উদারতায়, নামরান বড়ই মোহিত হইয়া, বিদায়-

কালে আমায় বলিল—"মেহেরবান্! আপনার কাছে আমার একটী অনুরোধ আছে।"

আমি বলিলাম—"কি অনুরোধ?"

নামরান। দুই চারিটী সম্ভ্রান্ত বন্ধুর জন্য কাল আমি একটী ক্ষুদ্র ভোজের আয়োজন করিব। আপনি যদি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বড়ই বাধিত হইব।"

আমি নামরানের এই সৌজন্যপূর্ণ নিমন্ত্রণ, প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। তাহাকে বলিলাম—"সেতো ভাল কথা। কাল রাত্রে আমি নিশ্চয়ই আপনার অতিথি হইব।"

সহাস্যমুখে আমায় বিদায় দিবার সময়ে, নামরান তাহার বসত বাড়ীর ঠিকানাটীও বলিয়া দিতে ভুলিল না।

আমি জুলেখাকে বাড়ীতে আসিয়া সমস্ত কথাই বলিলাম। সব কথা শুনিয়া সে বড়ই আহ্লাদিতা হইল। বলিল—"ভাই! লোকের নিমন্ত্রণটা খাইয়া থাকা ভাল নয়। তুমি এই নামরানকে আগামী কল্য রাত্রে আমাদের বাটীতে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসিও। দেখিবে তুমি, তাহার জন্য আমি এমন সব মুখরোচক খাদ্যের আয়োজন করিব, যাহা সে কখনও চোখে দেখে নাই।

জুলেখা তন্ত্রীরূপে কাজ করিতেছে। কাজেই তাহার ইঙ্গিতেই আমায় চলিতে হইতেছিল। আমি নামরানের গৃহে সেইদিন রাত্রে নিমন্ত্রণ রাখিতে উপস্থিত হইবামাত্র, সে আমায় খুব আদর যত্ন করিল।

আহারাদি শেষ হইয়া গেলে, জুলেখার উপদেশ মত আমি তাহাকে আমাদের বাটীতে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলাম। বলা বাহুল্য, সে সানন্দে আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল।

জুলেখা, নামরানের এই আতিথ্যস্বীকার সংবাদে, খুবই খুসী। বাঁদীদের লইয়া সমস্ত দিনই সে পাকশালায় কাটাইল। আমিও বাজার হইতে অতি উৎকৃষ্ট সেরাজী ও নানাবিধ ফলমূল, উৎকৃষ্ট আঙ্গুর, মিষ্টান্ন ও মসলাদি এই ভোজের জন্য লইয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার পর নামরান নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল। কক্ষগুলি অতি উজ্জ্বলভাবে আলোকিত। আমার স্থান যে ঘরে হইয়াছিল, তাহার বাহার খুব বেশী খুলিয়াছে।

বলা বাহুল্য, জুলেখা আমাদের সঙ্গে এই ভোজে যোগ দিল না। কারণ সে অবরোধনিবদ্ধা অন্তঃপুরিকা। আহারাদি শেষ হইলে, আমি অতিথির সম্মান রক্ষার্থে—সেরাজী ঢালিয়া নামরানের হাতে দিলাম। আমি নিজেও একটু খাইলাম। নামরান দেখিলাম, বড়ই সেরাজি-ভক্ত। কেন না—সে আমা অপেক্ষা খুব বেশী পরিমাণে এই গুলাববাসিত সেরাজী উদরস্থ করিয়া ফেলিল।

তাহার মত্তবতা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, আমি তাহাকে জুলেখার উপদেশমত বলিলাম—"এ রাত্রে, এ অবস্থায় আজ আর আপনার বাড়ী গিয়া কাজ নাই।"

নামরান তখন টলিতেছে। তাহার কথাগুলি জড়িত হইয়া আসি

তেছে। শয্যাশ্রয় করিতে পারিলেই সে যেন বাঁচে। কাজেই আমার পার্শ্বের বৈঠকখানায়, আমি তাহাকে শোয়াইয়া আসিলাম।

আমারও একটু গোলাপী-গোছের নেশা হইয়াছিল। এজন্য আমিও তখনই শয্যা আশ্রয় করিলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়া ছিলাম, তাহা জানি না। সহসা আমার কক্ষ মধ্যে উজ্জ্বল আলোক বিকাশ দেখিয়া আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

চক্ষু চাহিবামাত্র দেখিলাম—আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া জুলেখা। তাহার বামহস্তে এক উজ্জ্বল বর্ত্তিকা। দক্ষিণ হস্তে, রক্তাক্ত শাণিত ছুরিকা। তাহার সাঁচ্চাকাজ করা শুভ্রবসনেও শোণিত চিহ্ন।

এই বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখিয়া, আমি ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম। শয্যাত্যাগ করিয়া ভীতিবিহ্বল স্বরে বলিলাম—"এ সব কি জুলেখা? তোমার হাতে রক্তমাখা ছোরা কেন?"

জুলেখা, উন্মাদিনীর মত বিকট হাস্য করিয়া বলিল—"ভাই! এত দিনে আমার প্রতিহিংসা বাসনা পূর্ণ হইল। আমার সঙ্গে এস। তোমার সম্মানিত অতিথি নামরাণের কি দুর্দ্দশা করিয়াছি, একবার দেখিয়া যাও।"

আমি কম্পিতহৃদয়ে, আরও এক ভয়ানক দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া, পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম—সর্ব্বনাশী জুলেখা, অস্ত্রাঘাতে নামরাণের দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে। তাহার বক্ষঃনিঃসৃত শোণিতে, ঘরের মেঝে লোহিতবর্ণ হইয়াছে। আর তার প্রাণ-পাখী, দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া পলাইয়াছে।

জুলেখা—নারী না পিশাচী? হায়!, এ কলঙ্কের ভাগী ত সে একাকী নয়। আমিও যে এই ভীষণ ব্যাপারে অবাস্তব ভাবে লিপ্ত হইতেছি। আমিই যে নামরানকে অতিথিরূপে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম।

আমি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম—"কি ! ভয়ানক ব্যাপার! কি করিলি তুই সর্ব্বনাশী জুলেখা!"

জুলেখা সেই ছুরীখানা, ফেলিয়া দিয়া বলিল—"চুপ কর ভাই মনসুর! প্রাণের জ্বালায়, আমি এ কাজ করিয়াছি। কেন করিয়াছি, তাহা খুলিয়া বলিলে—তুমি আমার শোচনীয় জীবন-কাহিনীর সব কথাই অবগত হইবে। যে গোপনীয় কারণে হৃদয়ের কপাট তোমার মত নিঃস্বার্থ হৃদয় সুহৃদের নিকটেও এতদিন বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম—আজ তাহা তোমাকে খুলিয়া দেখাইব। কিন্তু আমার এ শোচনীয় কাহিনী শুনিবার আগে, এই রাত্রের মধ্যেই নামরানের মৃতদেহটাকে এই বাটীর উঠানের ঐ কূপের গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। নচেৎ আমাদের দুজনেরই নিস্তার নাই। নরহত্যা অপরাধে, আমাদের দুজনকেই রাজদণ্ডের অধীন হইতে হইবে।"

এক অপরিচিতা স্ত্রীলোককে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়া, সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা তাহার প্রাণ বাঁচাইয়া, আমি যে অতি অন্যায় করিয়াছি, তখন তাহা বুঝিতে পারিলাম। বিধাতা যাহাকে অমন সুন্দর রূপ দিয়াছেন, এমন মিষ্ট কথা দিয়াছেন, এতটা লজ্জা ও শীলতা দিয়াছেন, সে যে এমন পাষাণী হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া বড়ই অনুতপ্ত হইলাম। তখ

জুলেখার কলুষিত নিশ্বাস, এমন কি সাহচর্য্য পর্য্যন্ত, আমার পক্ষে বিষময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

আমি তাহাকে অতি রুষ্টভাবে বলিলাম,—"পাষাণী! কেন তুই এই নৃশংস কাজ করিলি? সমস্ত কথা আগে জানিলে আমি তোর কোন সহায়তাই করিতাম না। এখনি আমি কোতয়ালিতে সংবাদ দিব।"

জুলেখা, আমার হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুময় নেত্রে বলিল, "ভাই সব কথা কি তুমি ভুলিয়া গেলে? এক মাস আগে তুমিই যে একদিন আমাকে এক জীবন্ত কবরের মধ্য হইতে আহত অবস্থায় উদ্ধার করিয়াছিলে। অই নরপিশাচই ত আমার দেহে অস্ত্রাঘাত করিয়া আমাকে জীবন্তে সমাধি দিয়াছিল। এই শয়তান নামেরান আমার উপর যে ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল, আমি কি তার চেয়ে বেশী কিছু করিয়াছি? কেন যে সে আমায় জীবন্ত কবর দিয়াছিল, আমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, কেনইবা আমি এ নৃশংস কাজ করিলাম, তাহা তোমায় খুলিয়া বলিলে হয় ত আমার উপর তোমার একটু করুণা উপস্থিত হইবে।" এই কথা বলিবার পর ক্রোধে তাহার চক্ষু দুটী বাঘিনীর চোখের মত জ্বলিয়া উঠিল। সে ক্রমাগত একটা উত্তেজনা বশে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

(১৪)

তারপর সে একটু ঠাণ্ডা হইয়া বলিল,—"আমি সিরিয়ার সুলতানের একমাত্র কন্যা। যে সহরের মধ্যে আমরা বাড়ী ভাড়া লইয়াছি, ইহা সিরিয়ার উপকণ্ঠস্থ একটী ক্ষুদ্র সহর। সিরিয়ার রাজধানী, এই উপকণ্ঠ হইতে তিন ক্রোশ দূরে।

এই উপকণ্ঠে সিরিয়ার সুলতানের একটী ক্ষুদ্র প্রাসাদ আছে। আমি সেই প্রাসাদেই থাকিতাম। এ স্থানটার চারিদিকে পাহাড় আছে বলিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য, জায়গাটী আমি বড়ই পছন্দ করিতাম। আমার পিতা, গৌরবান্বিত সুলতান, গ্রীষ্মকালে কখন কখন এই উপকণ্ঠের প্রাসাদে থাকিতেন। তবে সেটা বছরে কয়েক মাস মাত্র।

সমস্ত কথা বিস্তারিত ভাবে বলিবার সময় এখন নাই, তবে যতটুকু বলিব, তাহা হইতে সহজেই সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিবে।

এই সহরের শেষাংশে একটী সুন্দর স্নানাগার আছে। দুইটা পাহাড়ের বক্ষমধ্যস্থিত হ্রদের জল হইতে এই স্নানাগার পরিপুষ্ট। সপ্তাহের মধ্যে দুইটী দিনমাত্র এই হামামটী রাজ-পরিবারের স্নানের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিত। এ দুই দিন অপর কাহারও সেখানে প্রবেশাধিকার থাকিত না।

একটা রূপের দর্প লইয়া, আমি এ ধরায় বিচরণ করিতাম। আমার পিতা আমাকে যথেষ্ট সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। নানা কারণে আম-

মনে একটা দর্প জন্মিল, যে আমার মত রূপবতীকে বিবাহ করিতে পারে, এমন রূপবান পুরুষ, এ দুনিয়ায় নাই।

কিন্তু বিধাতা আমার এ দর্প চূর্ণ করিলেন। এক দিন আমি শিবিকারোহণে চকের মধ্য দিয়া এই স্নানাগারে আসিতেছি, সেই সময়ে রাজপথের বিপরীত দিকের এক বিপণীমধ্যে উপবিষ্ট এই নামরানের দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল। আমি তাহার রূপ দেখিয়া মজিলাম।

প্রাসাদ হইতে স্নানাগারে যাইবার অন্য পথ অনেক ছিল। সে দিন আমার অধঃপতন ঘটিবে বলিয়াই, আমি শকটচালককে চকের পথ দিয়া হামামে যাইতে আদেশ করিয়াছিলাম।

আগে আগে প্রতি বৎসরে মাত্র দুইটী দিন, এই হামাম-স্নানের জন্য যাইতাম কি না সন্দেহ! কিন্তু এই নামারনকে দেখিয়া অবধি সপ্তাহে আমি দুই দিন করিয়া হামামে যাতায়াত আরম্ভ করিলাম। চকের মধ্যবর্ত্তী পথ ধরিয়া সাধারণ স্নানাগারে গেলেই, আমি নামরানকে তাহার বিপণীর মধ্যে দেখিতে পাইতাম।

ধরিতে গেলে, এই রূপবান শয়তান নামরান, ক্রমশঃ আমার সুখস্বচ্ছন্দ দর্প, অভিমান, রূপের গর্ব্ব ও আমার মনের শান্তি নষ্ট করিল। মনে ভাবিলাম, স্নানাগারে যাওয়া বন্ধ করিলেই আমি ইহাকে ভুলিতে পারিব! কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও তাহা পারিলাম না। অদর্শনে দর্শনাকাঙ্ক্ষা যেন আরও বাড়িয়া উঠিল।

সন্ধান লইয়া জানিলাম, নামরান একজন সৎকুলোদ্ভব ধনী ব্যবসায়ী।

সে এই সহরের সকলেরই নিকট সুপরিচিত। আমার পিতার রাজ-দরবারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও সে সরবরাহ করিয়া থাকে।

একবার মনে ভাবিলাম, আমার পালিকা বৃদ্ধা ধাত্রীর সহায়তায় পিতাকে বলিয়া ফেলি, যে আমি এই নামরাণকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু সেরূপ করিতে সাহস হইল না। পূর্ব্বের দর্প, লজ্জা, আভিজাত্যের অভিমান, আসিয়া আমার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল।

দিনে দিনে আমি তাপ-দগ্ধ লতিকার মত শুকাইতে লাগিলাম। পিতা শ্রেষ্ঠ হাকিমদের জড় করিয়া আমার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ঔষধ সকলেই দিল, কিন্তু রোগ কমিল না।

আমার পালক-মাতা ধাত্রীই শেষে আমার প্রকৃত ব্যাধি যে কি, তাহা ধরিতে পারিল। সে আমায় একদিন অতি কৌশলের সহিত প্রশ্ন করিয়া ভিতরের কথা জানিয়া লইল। বলা বাহুল্য, তাহারই সহায়তায়, এই নামরান আমার নির্ব্বাচিত স্বামীরূপে প্রহরীবেষ্টিত রাজপুরীর মধ্যে গুপ্তভাবে যাতায়াত করিতে লাগিল।

মিলনের আনন্দে দিন কতক আমরা দু'জনেই বিভোর হইয়া রহিলাম। নামরান আমায় প্রকাশ্যভাবে বিবাহ করিবার জন্য বড়ই একটা ঔৎসুক্য ও আগ্রহ দেখাইল। আমি তাহাকে পিতার নিকট আমাদের বিবাহ প্রস্তাব করিতে বলিলাম।

কিন্তু এই সময়ে কোন জরুরি রাজকার্য্য উপলক্ষে, পিতা সহসা এক দূরবর্ত্তী রাজধানীতে চলিয়া যাওয়ায়, নামরান তাহার মনের সঙ্কল্প কার্য্যে

পরিণত করিতে পারিল না। তাহার পরও সে দুই তিন দিন, হারেমের মধ্যে আসিল। কিন্তু তারপর সহসা যাওয়া আসা বন্ধ করিয়া দিল।

আমি আমার এক বিশ্বাসী বাঁদীকে তাহার বাটিতে পাঠাইলাম। সে এই সহরের মধ্যে একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। সুতরাং তাহার আবাসবাটির সন্ধান করিতে, বাঁদিকে বেশী কষ্ট করিতে হইল না।

নামারণ পুনরায় আসিল। মান অভিমানের অভিনয়ের পর, সে আমার চরণধারণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। বলিল,—"আমার এ অপরাধ স্বেচ্ছাকৃত নহে। আর কখনও তোমায় আমি এ ভাবে কষ্ট দিব না। আর কখনও তোমার নিকট এ সম্বন্ধে অপরাধী হইব না।"

এই ব্যাপারের পর, সে পরপর দুই দিন আসিল। তারপর তাহার আর কোন সংবাদই নাই। তাহার এ ব্যবহারে আমার মনে একটা সন্দেহের ছায়া দেখা দিল। মনে ভাবিলাম, এই সহরের সকল আমীর ওমরাহই আমার রূপের জ্যোতিতে মুগ্ধ। তাহাদের অনেকেই আমার হস্তপ্রার্থী হইয়া নিরাশ হইয়াছে। আর এই সামান্য ব্যবসায়ী নামরান কিনা আমায় উপেক্ষা করিতেছে? তাহা হইলে সে কি অপরা কোন রমণীর প্রেমাসক্ত হইয়া, আমাকে ভুলিয়াছে। এই ঈর্ষাই আমার সর্ব্বনাশ ঘটাইল। মনের বিষে, আমি দিবারাত্র ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। এই বিষের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া, একদিন রাত্রে, অন্ধকারে শরীর ঢাকিয়া, রাজপুরী হইতে বাহির হইলাম।

রাজপ্রাসাদ হইতে নামরনের বাড়ী বেশী দূর নয়। সে সম্প্রতি এক

লালরঙ্গের দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই বাড়ীটিকে লোকে "লালকুঠী" বলিত। আমাদের প্রাসাদের উপরের ছাদে উঠিলে, এই লালকুঠী দেখা যায়। সুতরাং সেই গভীর রজনীতে, নামরানের বাটীর সন্ধান করা আমার পক্ষে বেশী কষ্টকর হইল না।

এক কৃষ্ণবর্ণ বোরখায় আপাদমস্তক আবৃত করিয়া, আমি বাটীর বাহির হইলাম। কখনও এভাবে প্রাসাদের বাহিরে যাই নাই, এজন্য ভয়ে বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। এই অবস্থায়, আমি নামরানের বাটীর দ্বারে গিয়া করাঘাত করিলাম।

এক বৃদ্ধা বাঁদি আসিয়া প্রবেশদ্বার খুলিয়া দিল। আমি শুনিলাম, উপরের এক কক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি উঠিয়াছে। তৎসঙ্গে রমণীকণ্ঠে উচ্চ হাস্য কল্লোলও আমার শ্রুতিগোচর হইল। আর তৎপরক্ষণেই নামেরাণের উল্লাসময় চীৎকারধ্বনি আমার কাণে পশিল। আমি ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিলাম। যে নরাধম কুক্কুরকে প্রশ্রয় দিয়া, আমি বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া ছিলাম, তাহার এই ব্যবহার? এই ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতকতা! আমার প্রাসাদ দ্বারে উপস্থিত হইলে, যাহাকে আমার প্রহরীদের নিকট মাথা নোয়াইতে হইত, তার দ্বারপ্রান্তে নগরের শাসনকর্ত্তার কন্যা এবং রাজবংশীয়া হইয়াও আমি কিনা আজ অভিসারিকা বেশে উপস্থিত।

বাঁদীকে বলিলাম "তোমার মনিব নামেরান এখন কোথায়?" বাঁদী বুঝিতে পারিল না—যে আমার এই প্রশ্নের মধ্যে অনেক গূহ্য ব্যাপার আছে। সে সরল ভাবে বলিল—"আমার মনিব এখন তাঁহার

কাফ্‌রী প্রণয়িনীকে লইয়া আমোদআহ্লাদ করিতেছেন। বলুন—আপনি কি চান বিবি ?”

আমি বলিলাম—“তাঁহার সহিত আমি একবার দেখা করিতে চাই। এই কথা বলিয়া, আমি উপরের সিঁড়িতে উঠিতে গেলাম। বাঁদী আমায় বাধা দিতে আসিল। আমি তাহাকে সজোরে ধাক্কা দিবামাত্র, সে দূরে ঠিক্‌রিয়া পড়িল। ক্রোধ জর্জ্জরিত হৃদয়ে, আমি উপরে উঠিয়া গেলাম।

উপরে উঠিয়া, সম্মুখবর্ত্তী এক কক্ষ মধ্যে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে অভিমান ও উপেক্ষাসঞ্জাত ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া আমি দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইলাম। এই সময়ে সাহজাদীর দর্পটা, পূর্ণতেজে আমার জ্বালাসংক্ষুব্ধ হৃদয়মধ্যে শক্তিসঞ্চয় করিল। দেখিলাম, নামরান এক কৃষ্ণকায়া যুবতীকে তাহার পার্শ্বে বসাইয়া, আগ্রহভরে সানন্দচিত্তে তাহার সহিত প্রেমালাপ করিতেছে।

আমি কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, নামরানকে সজোরে পদাঘাত করিয়া বলিলাম—“তবে রে শয়তান! ঘৃণ্য কুক্কুর! আমার সহিত তোর এই ব্যবহার ?”

নামরান—সহসা আমাকে সেই ক্ষেত্রে রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইতে দেখিয়া যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল। সে যে কি বলিবে, কি করিবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না। সেই যুবতীও আমার ক্রুদ্ধ অবস্থা দেখিয়া, তখনই অন্য দ্বার দিয়া নীচে নামিয়া গেল। হতভাগ্য নামরান নিরুপায় হইয়া, আমার পায়ে ধরিয়া মার্জ্জনা চাহিল। নানারূপ

মিষ্টবাক্যে আমাকে সান্তনা করিল। আমি তাহার ছলনায়, ক্রোধ ভুলিয়া, পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম!

তারপর সেই শয়তান, উৎকৃষ্ট সেরাজি আনিয়া আমায় খাইতে দিল। তখন আমার রাগ পড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং আমি তাহার সহিত আমোদ প্রমোদে মত্ত হইলাম।

হায়! তাহার উপর এত সহজে বিশ্বাস স্থাপন করাটা, আমার একটা মহা ভ্রম হইয়াছিল। এ ভ্রমের ফল অতি শোচনীয়। হতভাগ্য ক্রমাগতঃ মিষ্টকথায়, তোষামোদে আমায় প্রলোভিত করিয়া, উত্তেজক মদিরা পান করাইল। মত্ততাজন্য আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম। তারপর সে যাহা করিয়াছিল, তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ।

আমায় সেই অর্দ্ধচেতনাময় অবস্থায়, সে অস্ত্রাঘাতে আমার সর্ব্বদেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া জীবন্ত প্রোথিত করিয়াছিল—আমাকে হত্যা করিয়া সে পদাঘাতের প্রতিশোধ লইয়াছিল। এ সব সাংঘাতিক ঘটনার পর আমি যদি আমার দিক হইতে একটা প্রতিশোধ লই, তাহাহইলে সেটা কি অতি নিষ্ঠুরের কাজ হয়—ভাই মনসুর?"

প্রায় মাসাধিক কাল এই সরাইখানায় থাকিয়া, জুলেখা যে ভীষণ কর্ম্মসূত্র জাল সৃষ্টি করিতেছিল, তাহার কার্য্য আজ শেষ হইয়াছে। তাহার অনুষ্ঠিত এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের সহায়তা করিয়াছি ভাবিয়া, আমি বড়ই অনুতপ্ত হইলাম।

এ সব কথা শুনিয়া আমি যে কি উত্তর দিব, তাহা ভাবিয়া ঠিক্

করিতে পারিলাম না। এই নরঘাতিনী রাক্ষসীকে দেখিয়া তখন আমার সর্ব্ব শরীরে একটা অগ্নিজ্বালা উপস্থিত হইয়াছিল। ক্রোধে আমার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতেছিল না।

জুলেখা তৎপরে বলিল—"যে মহাজনের কাছে তোমাকে প্রথমে টাকা আনিবার জন্য পাঠাই, তিনি আমার পিতার কোষাধ্যক্ষ। তোমার যদি অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহার নিকট হইতে তোমাকে প্রচুর অর্থ আমি আনাইয়া দিতে পারি। তুমি আমার সহিত আজ রাত্রের মত প্রাসাদে চল।"

আমি বলিলাম—"জুলেখা! আমি উপলক্ষ্যরূপে তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছি। তোমার স্নেহে ভুলিয়া, ভগ্নির মত তোমাকে যত্ন করিয়াছি, বিশ্বাস করিয়াছি। যখন যা আদেশ করিয়াছ—তাহাও করিয়াছি। আগে যদি আমি তোমার মনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কোনরূপে বুঝিতে পারিতাম, তাহাহইলে আমি তোমাকে একটুও সাহায্য করিতাম না। এই নরহত্যার সহায়তা করার ভীষণ কলঙ্ক, প্রকারান্তরে আমারই উপর পড়িতেছে। তোমার সহিত প্রাসাদে যাওয়া দূরে থাক্—এই মুহূর্ত্ত হইতে তোমার সহিত কোন সম্পর্কই আমি রাখিতে চাহি না।"

এই কথা বলিয়া, সেই রাত্রেই আমি সেই সরাইখানা হইতে চলিয়া আসিলাম। জুলেখা, কি করিল বা কি করিবে, তাহা দেখিবার কোন বাসনাই হইল না।

দুইচক্ষু যে দিকে লইয়া যাইতেছিল, সেই দিকেই চলিতেছিলাম।

প্রায় ঘণ্টা দুই এইভাবে আসিবার পর, আর একটী ক্ষুদ্র সহর দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তাহার প্রবেশদ্বার বন্ধ।

বড়ই শ্রান্ত ক্লান্ত—আমি। আঁমার সৌভাগ্যক্রমে, নগরের প্রবেশ-পথের সম্মুখেই, এক সরাইখানা দেখিতে পাইলাম। সরাইটী প্রথম শ্রেণীর না হইলেও, আশ্রয়স্থানাভাবে অগত্যা আমি তথায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলাম। এই ক্ষুদ্র নগর প্রাচীরবেষ্টিত। রাত্রের প্রথম প্রহরের পরই তাহার সদর ফটকের চাবি বন্ধ হইয়া যায়। কাজেই সে রাত্রে নগর মধ্যে প্রবেশ করিবার আর কোন উপায়ই নাই।

সেই রাত্রিটা কষ্টেশ্রেষ্ঠে সেই সরাই থানায় যাপন করিয়া, আমি পর দিন প্রভাতে যেমন নগর তোরণের বাহিরে আসিয়াছি—অমনি একজন লোক আমায় দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। সে এক দৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"এই সেই শয়তান! যে আমার প্রভুকে কাল উহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া, হত্যা করিয়াছে।"

কথাটা শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। লোকটার পিছনে যে তিন চারিজন প্রহরী ছদ্মবেশে আসিতেছিল, তাহা আমি জানিতাম না। বলা বাহুল্য, তখনই তাহারা অগ্রসর হইয়া আমায় বন্দী করিয়া কোতোয়ালিতে লইয়া গেল।

সিরিয়া জনপদের আইন ছিল, দেশাধিপতি নিজে হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে সমস্ত মামলার বিচার নিষ্পত্তি করিতেন। কাজেই ফৌজদারীর লোক আমায় রাজধানীতে চালান দিল। প্রথম দিন কারাগারেই কাটিল।

পরদিন আমি সুলতানের নিকট বন্দীভাবে আনীত হইলাম। এই সুলতানই জুলেখার পিতা। মনে ভাবিলাম, জুলেখা নিশ্চয়ই এতক্ষণে রাজ-প্রাসাদে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বোধ হয় সে জানিতে পারে নাই, আজ তাহারই জন্য আমার এই দুর্দ্দশা আমি হত্যাপরাধে মরিতে বসিয়াছি।

প্রহরীরা এই খুনের অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্য, আমায় নিদারুণ ভাবে কশাঘাত করিতে লাগিল। আমার অঙ্গ ফাটিয়া শোণিত স্রোত বাহির হইল। আমি যন্ত্রণায় অধীর হইলাম, তবু জুলেখার নাম পর্য্যন্ত করিলাম না।

সুলতানের তবিয়ৎ ভাল নয়, এজন্য তিনি একটী নির্জ্জন কক্ষে বিচার করিতে বসিয়াছেন। সে কক্ষে সহরের প্রধান কোতোয়াল, রাজমন্ত্রী, জন দুই শরীররক্ষী, আর আমি উপস্থিত।

সুলতান, আমার মুখের দিকে চাহিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কি ভাবিয়া বলিলেন—"যুবক! তোমার কৃতাপরাধ স্বীকার কর। তোমার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া আমার অত্যন্ত দয়া উপস্থিত হইয়াছে। কেন, এবং কি কারণে আমার রাজ্যের একজন ধনী ব্যবসায়ীকে তুমি এরূপ নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিলে তাহার কারণ জানিতে আমি বড়ই উৎসুক।"

আমি যুক্তকরে বলিলাম—"জনাব! জাঁহাপনা! আমি খোদার নাম লইয়া বলিতেছি, এ হত্যাকাণ্ড আমার দ্বারা হয় নাই। যাহার দ্বারা হইয়াছে, কোন মতেই তাহার নাম আমি প্রকাশ করিব না। প্রকাশ্য সভাস্থলে তাহা প্রকাশ করিবারও কোন উপায় নাই। সুলতানের

বিচারে আমি যদি দণ্ডার্হ হই—তাহাহইলে যে কোন কঠোর দণ্ড ব্যবস্থা জাঁহাপনা করিতে পারেন। ঘটনাচক্রের দাসরূপে, নির্দ্দোষী হইয়াও আমি তাহা অম্লান মুখে সহ্য করিব। নানা কারণে জীবনের প্রতি আমি বীতরাগ হইয়াছি। আত্মহত্যাও করিতে পারিব না কেননা—আত্মনাশ মহাপাপ। সুতরাং রাজদণ্ডের ফলে, যদি আমার এ দুঃখময় জীবনের, এই ভারি বোঝাটা নামাইতে পারি, তাহা হইলে বিশেষ সুখী হইব।"

তাঁহার মন্ত্রী ও সহর কোতয়ালের সহিত কিয়ৎক্ষণ পরামর্শ করিয়া সুলতান বলিলেন—"যুবক! সমস্ত প্রমাণ তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেছে। তুমিই এই নামরানকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলে। তোমার কক্ষের পার্শ্বেই ইহার রুধিরাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া ছিল। এসব প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া, আমি তোমায় কোন মতেই মার্জ্জনা করিতে পারি না। এ রাজ্যের নিয়ম—"জীবনের পরিবর্ত্তে জীবন।" কাল প্রভাতে তোমায় মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া হত্যা করা করা হইবে।"

এই ভীষণ দণ্ডকথা শুনিয়া, আমি মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া উঠিলাম। তখনও আমি সেই করুণাময়-খোদার উপর বিশ্বাস হারাই নাই। মনে মনে ভাবিলাম, লতিফার শোচনীয় মৃত্যু স্মৃতি আমার মনে দিবারাত্র জ্বলন্ত চিতার মত জ্বলিতেছে। এরূপ স্থলে জীবন আমার পক্ষে ঘোর বিড়ম্বনা-ময়, দুঃখময়। মরিলেই যখন আমি সকল জ্বালা হইতে উদ্ধার পাইব, তখন মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ।

এই সময়ে আর এক অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত! সহসা এক অবগুণ্ঠনবতী রমণী, সেই সভাস্থলে আসিয়া তাহার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া বলিল “পিতঃ! রাজ্যেশ্বর! বিনাদোষে এক নিরপরাধী যুবকের প্রাণদণ্ড করিয়া আপনার রাজদণ্ড কলঙ্কিত করিবেন না। এ যুবক এই হত্যাকাণ্ডের জন্য একটুও দায়ী নহে। আপনার স্নেহময়ী কন্যাই এই শয়তান নামরানকে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছে। এই সেই রুধিরাক্ত শাণিত ছুরিকা, যাহাতে এখনও নামরানের শোণিত চিহ্ন লাগিয়া রহিয়াছে।”

আমি দেখিলাম, আমার জীবন রক্ষার জন্য জুলেখা সে ক্ষেত্রে স্বর্গের দূতীরূপে উপস্থিত হইয়াছে। মনে মনে আমি খোদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম, ও ঘটনা স্রোত কোথায় গিয়া দাঁড়ায়, তাহা দেখিবার জন্য উৎসুক চিত্তে, কম্পিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

জুলেখা বলিল—“জাঁহাপনা! যদি আপনি এই হত্যারহস্য সম্বন্ধে সমস্ত কথা শুনিতে চান্, তাহা হইলে আমার সহিত কক্ষান্তরে চলুন।”

সভাস্থ জনবর্গ এই ব্যাপার দেখিয়া, বড়ই বিস্মিত হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলেন। সুলতান তাঁহার কন্যাকে লইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে সুলতান, সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—“খোদাকে ধন্যবাদ! যে তোমার মত নির্দ্দোষীর জীবন, অকারণে নষ্ট হইল না। যুবক! তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। তুমি যদি আমার কর্ম্মচারিদের নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিতে তাহা হইলে

বোধ হয় ঘটনা স্রোত এতদূরে পৌঁছিত না। আমি তোমার মুক্তির আজ্ঞা দিতেছি। আর আমার কন্যার অনুরোধে, তোমাকে এ রাজ্যের এক উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিলাম। সে তোমাকে ভ্রাতৃসম্বোধন করিয়াছে। তুমি এখন হইতে আমার পুত্রস্থানীয় হইলে।

আমি করজোড়ে বিনীতভাবে বলিলাম—"সুলতান! জাঁহাপনা! আপনার এই অযাচিত করুণার জন্য, আমি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু নানা ঘটনায়, আমি এই রাজানুগ্রহ গ্রহণ করিতে আমি ইচ্ছুক নহি। এজন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।"

আমার অনিচ্ছা দেখিয়া সুলতান বিমর্ষচিত্তে বলিলেন—"যুবক! তাহা হইলেও আজ তুমি আমার আতিথ্য স্বীকার কর। কাল যেখানে ইচ্ছা তোমার, সেইখানে চলিয়া যাইও।

অগত্যা আমি বাধ্য হইয়া সেই দিন রাজ প্রাসাদে রহিলাম। জুলেখা আমার পরিচর্য্যার ভার লইল। সে আমায় সুলতানের অধীনে চাকরি গ্রহণের জন্য নানাপ্রকারে বুঝাইল। কিন্তু কিছুতেই আমি তাহার পিতার অধীনে চাকরি করিতে সম্মত হইলাম না।

বিদায় কালে জুলেখা, আমায় একটী স্বর্ণমুদ্রা ও রত্নপূর্ণ থলিয়া দিয়া বলিল—"ভগ্নির স্নেহোপহার বিবেচনা করিয়া, এটি তোমার কাছে রাখিও। তোমার জীবন লক্ষ্যহীন! বিদেশে, অপরিচিত স্থানে প্রয়োজন সময়ে এই অর্থ তোমার যথেষ্ট সহায়তা করিবে।" জুলেখার বিশেষ অনুরোধে, আমি তাহার এ স্নেহের উপহার প্রত্যাখান করিতে পারিলাম না।

সুলতান ও জুলেখার নিকট হইতে সেই দিনই বিদায় লইয়া আমি সিরিয় রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিলাম।

(১৫)

সমস্ত দিন অক্লান্তভাবে পথ চলিয়া, রাত্রে এক অপূর্ব্বপরিচিত সরাইখানার আশ্রয় লইলাম। সেই সরাইখানায় অনেকগুলি কায়রো-যাত্রী ব্যবসায়ী সমবেত হইয়াছিল।

তাহাদের সঙ্গলাভে, আবার আমার মন কায়রোর দিকে ঝুঁকিল। সেখানে গেলে আমার জীবন বিপন্ন হইবে, আবার হয় তো আমি মিশরাধিপের প্রহরীদের হাতে পড়িব, লাঞ্ছনারও শেষ থাকিবে না। কিন্তু তবুও আমার প্রাণ কি যেন একটা অব্যক্ত কারণে, কায়রোর দিকে বড়ই ঝুঁকিয়া পড়িল।

স্বর্গের সুষমা সেই সুন্দরী লতিফা! সে কি মরিয়াছে? অত সুন্দর যে—মৃত্যু কি তাহাকে গ্রাস করিতে পারে? আশা আমার কাণে কাণে বলিল—"যদি দৈবপ্রেরিত অদ্ভূত উপায়ে, খোদার কৃপায় তুমি বাঁচিতে পার, তাহা হইলে লতিফা কি বাঁচিতে পারে না? যাও তুমি—আবার সেই কায়রোতে। সেখানে গেলে, নিশ্চয়ই তুমি লতিফাকে দেখিতে পাইবে।"

একদিনের জন্যও আমি সেই ভীষণ ঘটনাময় রজনীর কথা ভুলিতে

পারি নাই। তৎপরে সর্ব্বনাশিনী জুলেখার এই শোচনীয় ব্যাপারে আমার চিন্তাস্রোত দিনকয়েকের জন্য অন্যদিকে ধাবিত হইলেও, প্রতি রজনীতেই প্রাণময়ী মূর্ত্তি লইয়া লতিফা আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইত।

যথাসময়ে আমি কায়রোর নিকটবর্ত্তী এক গণ্ডগ্রামে উপস্থিত হইলাম। এ গ্রামে কেবল নীচশ্রেণী জালজীবির বাস।

দেখিলাম—নীলনদের তীরে একস্থানে কতকগুলি ধীবর সমবেত হইয়া কি একটী গোলমাল উপস্থিত করিয়াছে। আমি ধীরে ধীরে তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইলাম।

ঘটনাটা এই, একজন জালজীবি নদীতে জাল ফেলিয়া, একটী কাঠের ক্ষুদ্র সিন্দুক পাইয়াছে। আর তাহা লইয়াই একটা মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে।

তাহাদের মধ্যে একজন, যাহাকে সেই দলের প্রধান বলিয়া বোধ হইল সে বলিল—"কাজ নেই ওই সিন্ধুক নিয়ে। এখনি জলে ফেলে দে। সেবারে সেই চামড়ার থলিটা তুলে যে কি লাঞ্ছনা হয়েছিল, তা তোদের মনে আছে ত।"

যে লোকটা সিন্দুক তুলিয়া ছিল—সে বলিল—"মুরুব্বি যা বলেছে, তাই ঠিক্। দে জলে ফেলে দে—ঐ সিন্দুকটা।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, সেই সিন্দুকটী তাহারা নীলনদের গভীর জলে ফেলিয়া দিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। আমি যে তাহাদের পিছনে দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিয়াছি—সেটা তাহারা লক্ষ্য করে নাই।

সেই দলের পূর্ব্বকথিত মুরুব্বি—আমায় তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইতে দেখিয়া যেন একটু ভয় পাইল। সে সন্দিগ্ধস্বরে বলিল—"কে আপনি সাহেব! কি চান্ আপনি?"

আমি বলিলাম—"দোস্ত! আমি একজন বিদেশী মুসাফের। তোমায় কেবল একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। আর তাহার সদুত্তর পাইলে তোমাকে প্রচুর পুরস্কার দিতেও রাজি আছি।

এই কথা বলিয়া তাহাকে আমি একটু অন্তরালে লইয়া গেলাম। একটী স্বর্ণমুদ্রা তাহার হাতে দিয়া বলিলাম—"একটু আগে তুমি বলিয়াছ যে একটী চর্ম্মনির্ম্মিত থলিয়া জল হইতে তুলিয়া, তোমরা একদিন মহা-বিভ্রাটে পড়িয়াছিলে। সে থলিয়ায় ছিলই বা কি? আর সে কত দিনের কথা!"

সেই ধীবর রাজ বলিল—"মহাশয়! সে আজ দুই তিন মাসের কথা। আমি নিজেই সে দিন জাল ফেলি। একটা উষ্ট্রচর্ম্মের সুবৃহৎ থলিয়া আমার জালে পড়ে। থলিয়া তীরে আনিয়া, তাহার মুখ খুলিবা-মাত্রই দেখিতে পাই—যে তাহার মধ্যে এক পরমাসুন্দরী রমণীর চেতনা-বিহীন দেহ।"

আমি সোৎসুকে, বিস্ময়বিকম্পিত স্বরে বলিলাম "বল কি? তাহার পরিধেয় বস্ত্র কিরূপ ছিল বল দেখি?"

মুরুব্বি বলিল—"তাহার পরিধানে ছিল এক নীলবর্ণের স্বর্ণ খচিত শাটী। আর হাতে তিনটী আংটী ছিল।"

আমি। তার পর?

মুরুব্বি। তারপর আমরা তাহার দেহ পরীক্ষায় বুঝিলাম, তখনও সে জীবিত আছে। অনেক চেষ্টা চরিত্র করিয়া, আমরা তাহার চেতনা সম্পাদন করাইলাম। সে আমাদের কাছে কন্যার মতই রহিয়া গেল।

আমি। তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই যুবতী এখনও তোমাদের কাছে আছে? কেমন কি না?"

মুরুব্বি। না! একদিন সে আমাদের সহিত নদীতীরে বেড়াইতে গিয়াছিল। কায়রোর শাসনকর্ত্তা, মনশুর জঙ্গ সেই সময়ে নদীপার হইতে ছিলেন। তীরে উত্তীর্ণ হইয়াই তিনি সেই যুবতীকে দেখিয়া চমকিত ভাবে আমাদের নিকটে আসিলেন। আমাদের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"এই রমণী সুলতানের নিকট গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী। তাঁহার আদেশেই থলির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া উহাকে নদের জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। তোমরা ইহার জীবন রক্ষা করিয়া, রাজদ্বারে অপরাধী হইয়াছ। আমি তোমাদের সকলকেই গ্রেপ্তার করিব।"

আমরা অনেক অনুনয় বিনয় ও কান্নাকাটি করিয়া, তাঁহার নিকট মার্জ্জনা চাহিলাম। তিনি আমাকে অভয় প্রদান করিয়া বলিলেন—"কোন ভয় নাই তোমার। আমার সঙ্গে তুমি রাজদরবারে চল। তোমাকে কেবল মাত্র এই সাক্ষ্য দিতে হইবে—যে এই যুবতীকে তুমি নদীগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়াছ।"

আমি সেই মুরুব্বির হাতে ধরিয়া বলিলাম—"সেই রমণীর নামটি কি তোমরা জানিবার কোন সুযোগ পাইয়াছিলে কি?"

মুরুব্বি। হাঁ খুবই পাইয়াছিলাম। সে আমাকে পিতৃসম্বোধন করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল যে তাহার নাম—"লতিফা।"

আমি উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া বলিয়া বলিলাম—"ইয়ে মেহের বান আল্লা! এ সব কি শুনি?"

আমার এই উন্মাদবৎ অবস্থা দেখিয়া, সেই মুরুব্বি আলি খাঁ বলিল—"জনাব! একথা শুনিয়া আপনি এত কাতর হইলেন কেন?"

আমি বুঝিলাম—এ ভাবে অধৈর্য্য হইয়া, আত্মপ্রকাশ করিয়া আমি বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছি। এজন্য তখনই আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলাম—"তারপর রাজসভায় গিয়া কি দেখিলে! সেখানে কি হইল?"

আলি খাঁ—"বলিল—তারপর যা হইবার তাহাই হইল সাহেব! সুলতান, সেই রমণীকে দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তখনই তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন। হুকুম হইল—সেইদিন রাত্রে তাহাকে নিষ্ঠুর ভাবে ভূপ্রোথিত করিয়া হত্যা করা হইবে। আর আমি এই সাক্ষ্য দানের জন্য ও তাহার দেহ উদ্ধার করার জন্য একটী অঙ্গুরীয় পুরস্কার পাইলাম। বলা বাহুল্য, সেই রমণীর অঙ্গুলি হইতেই—এই অঙ্গুরীয়কটি আমাকে দিবার জন্য সুলতান আদেশ করিয়াছিলেন।

আলিখাঁর কথায় তখন আমার প্রাণে দাবানল জ্বলিতেছিল। সর্ব্ব-শরীর যেন বিদ্যুতের আগুণে পুড়িয়া ছাই হইতেছিল। কিন্তু তখনও

প্রত্যয় হইতেছিল না, যে এই আলি খাঁর বর্ণিতকাহিনী সত্য ও সম্ভব হইতে পারে কিনা?

আমি আলিকে বলিলাম—"সেই বহুমূল্য অঙ্গুরীয় এখনও তোমার কাছে আছে কি?

আলি খাঁ বলিল—"আছে বৈ কি? দামী অঙ্গুরী বলিয়া ঐটী এ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে আমাদের সাহস হয় নাই?"

আমি। আমায় সে আংটিটি একবার দেখাইতে পার?

আলি খাঁ। খুব পারি। আপনি আমার সঙ্গে আমার বাড়ীতে আসুন।

আমার আকস্মিক ভাব পরিবর্ত্তন ও উত্তেজনাময় কথাগুলি শুনিয়া আলি খাঁ, একটু থতমথ খাইয়া গিয়াছিল। সে আমাকে তাহার বাটীতে লইয়া আসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া আনিয়া আমাকে দেখাইল।

আমি দেখিলাম, সেই অঙ্গুরীয়কটী আমার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী। সেই ভীষণ রজনীতে মিলনের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপে, আমিই তাহা লতিফার অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিয়াছিলাম। লতিফার নিজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী তখনও আমার হাতে।

আমি আলিখাঁকে বলিলাম,—"ভাই! কত টাকা হইলে তুমি এ আংটী আমায় বিক্রয় করিতে পার?"

আলি খাঁ বলিল,—"ইহা যখন আমাদের কোন প্রয়োজনে লাগিবে

না, বা আমরা মনিকারের কাছেও বিক্রয় করিতে সাহস করি না, তখন আপনিই না হয় এ আংটিটি কিনিয়া লউন।"

আমি তখনই আমার থলিয়া হইতে পঞ্চাশটী স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া আলিখাঁর হাতে দিলাম। সে ইহাতে বড়ই খুসী হইল। আর তখনই সেই অঙ্গুরীয় আমার হাতে পরাইয়া দিল।

আমি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে, অতি প্রিয়, অতি সুন্দর, অতি পবিত্র জিনিসের মত, লতিফার সেই অঙ্গুরীয়কটী বহুবার চুম্বনাঙ্কিত করিয়া, প্রাণে একটা মহাতৃপ্তি, মহাশান্তি পাইলাম।

তৎপরে আমি আলিকে বলিলাম,—"যদি আমাকে পরপারে লইয়া যাইবার জন্য একখানি নৌকা ঠিক করিয়া দাও, তাহা হইলে আমি বিশেষ উপকৃত হই।"

আলি বলিল,—"আমার নিজেরই নৌকা আছে। আমি সেই নৌকায় করিয়া আপনাকে পার করিয়া দিতেছি। আমার সঙ্গে আসুন।"

আমি তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলাম। কিছু দূর গিয়া আমরা নৌকায় উঠিলাম। স্রোতের সহিত এক ঘণ্টা যুদ্ধ করিয়া, আমরা পরপারে অর্থাৎ কায়রো সহরে পৌছিলাম।

(১৬)

আলি তাহার নৌকা লইয়া চলিয়া গেল। আমি সৈকতভূমি ত্যাগ করিয়া সহরের বাহিরের পথ আশ্রয় করিলাম। আমার চক্ষুর্দ্বয় যে দিকে আমায় লইয়া যাইতেছিল আমি সেই দিকেই চলিলাম।

প্রাসাদসমীপে পৌছিয়া দেখিলাম, অদূরে সেই প্রস্তর প্রাচীরের উপর সেই বাতায়ন। সেই রাজপ্রাসাদ, সেই কক্ষ। সবই আছে—সে নাই। দেহ আছে—প্রাণ নাই। সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি আছে, কিন্তু যাহার সুর হইতে এই প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হইয়াছিল—সে নাই। একটীমাত্র মর্ম্মভেদী নিশ্বাসে আমার প্রাণের জ্বালা ফুটিয়া বাহির হইল। জানি না সেই নিশ্বাস সেই অভিশপ্ত বাতায়নতলে পৌছিয়া ছিল কি না?

সুলতানের রাজপ্রাসাদ বজ্রাঘাতে চূর্ণ হউক। প্রচণ্ড প্রলয়ের ঝটিকা তাহার সমুন্নত মিনারগুলিকে ধূলিসাৎ করিয়া দিক্ কি ক্ষতি তাহাতে আমার! এ নিষ্ঠুর দুনিয়ার সহিত আমার সব সম্পর্ক লোপ হইয়াছে।

মনে ভাবিলাম যাই কোথায়? লতিফার শেষ পরিণাম সম্বন্ধে এই আলি আমাকে যাহা বলিয়াছিল, তাহার উপর আমি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই। মনে ভাবিলাম, এ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই শোচনীয় ব্যাপারের শেষ পর্য্যন্ত আমায় জানিতে হইবে।

একটা সুবিধা এই দেখিতে পাইতেছি, যে এই সহরের মধ্যে একটু ছদ্মবেশে থাকিলে, কেহ আমায় চিনিতে পারিবে না। আমাদের এ

অপরাধের বিচারদণ্ড গভীর নিশীথেই হইয়াছিল। রাজান্তঃপুরের এ সব ব্যাপার, আর কাহারও দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হওয়া অসম্ভব।

আমি আমার পূর্ব্ব পরিচিত সেই সরাইখানায় আশ্রয় লইতে সাহসী না হইয়া, আর একটী নূতন সরাই খুঁজিয়া লইলাম।

এই সরাইটী প্রাসাদের খুব কাছে। আমার কক্ষের বাতায়ন খুলিলে লতিফার কক্ষের সেই শোচনীয় স্মৃতিমাখানো বাতায়নটী দেখা যায়। আর উন্মাদের মত উদাস দৃষ্টিতে সেই বাতায়নের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলেও, যেন একটা শান্তি আসে।

জুলেখার প্রদত্ত এক শত স্বর্ণ মুদ্রার মধ্যে, তখনও আমার কাছে পঞ্চাশটী মুদ্রা ও রত্নাদি ছিল। আমি তাহার সহায়তায় যথাসাধ্য আত্ম গোপন করিয়া কায়রোতে দিন কাটাইতে লাগিলাম।

মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, যখন কক্ষ মধ্যে থাকি, এক একবার সতৃষ্ণ নয়নে, লতিফার কক্ষের সেই বাতায়নের দিকে দৃষ্টিপাত করি। তাহাতে সুখ দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত কত কথাই আমার মনে জাগিয়া উঠে।

সেই কক্ষ রাত্রে শত শত বর্ত্তিকার আলোকে কোন কোন দিন উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। তাহাতেও আমার মনে হইত সেই কক্ষ যেন ঘোরান্ধকারাচ্ছন্ন! হায়! যাহার জন্য সে কক্ষের জ্যোতিঃ—সে ত সেখানে নাই।

মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাসে আমার মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়িয়া যায়। চোখের সম্মুখে, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া উঠে। আমি ব্যাকুল ভাবে, জ্বালাময়

প্রাণে, ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে সেই কক্ষ মধ্যে পদচারণা করি। লতিফার অধিকৃত সেই কক্ষের দিকে চাহিয়া থাকিলে, মর্ম্মচ্ছেদী শোকে দরদর ধারায় আমার বুক ভাসিয়া যায়। অস্থিপঞ্জর, মেদমজ্জা, যেন প্রবল অগ্নি দাহে জ্বলিতে থাকে।

হায়! এমন করিয়া কাঁদিলে, ভাবিলে, দীর্ঘশ্বাস ফেলিলে কি তাহাকে পাইব? সেই কুসুমকোমল দেহ যে চিরশীতল সমাধিগর্ভে নিহিত। সুকোমল দুগ্ধফেননিভ পর্য্যঙ্কে শুইলে, যাহার সুনিদ্রা হইত না, আজ যে সে চির কঠিন মৃত্তিকা শয্যায় চির দিনতরে নিদ্রিত!

এই ভাবে দুই তিন দিন কাটিল। গৃহকক্ষ যেন আমার চক্ষে মরুভূমির মত হইয়া উঠিল। দুঃখের ও মহা বিরহের স্মৃতি আমার মনে দিন রাতই দাবানল জ্বালা সৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু রক্ত মাংসের শরীর। নিত্য এ জ্বালা ত সহ্য করিতে পারি না। পারে না। মানুষের সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে তো।

এই ভাবে প্রায় দুই পক্ষকাল কাটিয়া গেল। সহরের নানা স্থানে উন্মাদের মত ঘুরিয়া বেড়াই। কখন কখনও বা পিরামিডের ধারে বেড়াইতে যাই। সেই জনশূন্য পিরামিডের স্থূল পাষাণখণ্ডের উপরে বসিয়া, আকুল স্বরে, চারিদিকের বিরাট নিস্তব্ধতাকে কম্পিত করিয়া, উচ্চরবে কখনও কখনও চীৎকার করিয়া উঠি, "লতিফা! লতিফা!" আমার জীবনানন্দ দায়িনী দেবীরূপিণী লতিফা—স্বর্গ ও মর্ত্তের মধ্যে যদি কোন সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলে একবার আমায় দেখা দাও। এ নির্জ্জনস্থানে

কেহই আমাদের মিলনে বাধা দিবেনা—ধ্যান ভঙ্গ করিবে না। এস লতিফা! একবার তোমার স্বর্গসুরভিমাখা সমুজ্জল কান্তি লইয়া আমার নেত্রসম্মুখে! অত নিষ্ঠুর হইও না।"

সে আকুল চীৎকার দিগ-দিগন্তে বিলীন হইয়া যায়। কেউ শোনেনা কাহারও মর্ম্ম স্পর্শ করে না। নীরব, নিশ্চল, কঠিন পাষাণ অতি নিষ্ঠুর ভাবে কেবল নীরস প্রতিধ্বনি ফিরাইয়া দেয়।

পিরামিডের পার্শ্ববর্ত্তী এক নির্জ্জন সমাধিক্ষেত্রের মধ্যে গিয়া, লতিফার কথা চিন্তা করায়, মনের ভার যেন অনেকটা কমিয়া যাইত। আমার প্রাণময়ী দেবী লতিফার নাম বহু বার উচ্চারণ করিয়া, আমি মনে যেন একটা অপার্থিব শান্তি পাইতাম।

মনে ভাবিতাম,—"মৃত্যুই ত এ জীবনের শেষ পরিণাম। আমরা সকলেই ত জানি এক দিন মরিতে হইবে। যে সমশের জঙ্গের প্ররোচনায়, মিশরাধিপ আমাদের মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ত এই মৃত্যুর অধীন। এই যে বিরাট পাষাণস্তূপ বিশালদর্শন পিরামিড, যাহা সহস্রাধিক বর্ষ কাল কোন ভাগ্যবানের বিত্তবানের মৃত্যুর স্মৃতি আজও বহন করিতেছে, তাহাও ত মৃত্যুর স্মরণস্তম্ভ! তবে কেন ভাবি, তবে কেন কাঁদি? তবে কেন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি! মরিবার পর কি আর কোন জীবন নাই? সেখানে কি লতিফাকে পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই?

এইরূপ চিন্তার প্রাণে একটা শান্তি পাই। কিন্তু সে শান্তি অনধিকক্ষণ

স্থায়ী। আমার প্রাণের আশা ত একটুও মেটে নাই, দর্শনের সুখ ত একটু তৃপ্তি লাভ করে নাই! এ বিশাল বক্ষ ত তাহাকে দীর্ঘকাল আলিঙ্গন করিতে পায় নাই। এ শ্রুতিযুগল ত বহুকাল তাহার বীণা ঝঙ্কার শুনিতে পায় নাই। অতৃপ্ত আশা, বিরাট আকাঙ্খা লইয়া আমি পাঁজার আগুনের মত ধীরে ধীরে পুড়িতেছি। হায়! যে মৃত্যু আমার প্রাণাধিকাকে গ্রাস করিল, সে মৃত্যু আমার কিছুই করিতে পারিতেছে না কেন? আমি মরিয়া আবার বাঁচিলাম, কিন্তু সে বাঁচিয়া আবার মরিল কেন? করুণাময় খোদা! তোমার এ কি অদ্ভুত ব্যবস্থা প্রভু?"

আবেগভরে দারুণ মর্ম্মযাতনায় আমি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম,—"লতিফা! লতিফা! আমি এই প্রেত-রাজ্যের অন্ধকারময় দ্বারে বসিয়া, তোমায় ডাকিতেছি। একবার দেখা দাও! না দাও বলিয়া যাও—পরলোকে গেলে তোমায় পাইব কি না?"

সহসা এই সময়ে আমি যেন পিছনে কাহারও পদশব্দ পাইলাম। সেই বিরাট পাষাণস্তুপের অন্ধকারময় নিশুতি অবস্থার মধ্যে, মানুষের পদশব্দ পাইয়া, একটু চমকিত হইয়া উঠিলাম।

শুনিয়াছিলাম, এই সমস্ত নর-সমাধির গভীর গহ্বর মধ্যে, অতীত কালের ধন-সম্পত্তি প্রোথিত আছে। এজন্য এ সকল স্থানে তস্করের উপদ্রব বেশী। এই নীরব জনসমাগম শূন্য নিশীথে এ স্থানে যে প্রেতের আগমন সম্ভাবনা নাই, তাই বা কে বলিতে পারে?

আমার নিকট অর্থ নাই, যে তস্করে অপহরণ করিবে। কিন্তু

রাজদ্বারে ত অপরাধী আমি। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, দৈব উপায়ে জীবন প্রাপ্ত হতভাগ্য আমি। যদি কোন রাজপ্রহরী ছদ্মবেশে আমার অনুসরণ করিয়া থাকে? যদি আমায় আবার ধরিয়া ফেলে? তাহা হইলে কি হইবে?

আমি সেস্থান ত্যাগ করিয়া নীলনদপার্শ্বস্থ এক ক্ষুদ্র রাজপথে উপস্থিত হইলাম। সেথানেও এইরূপ পদশব্দ! স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম—অদূরে কৃষ্ণবর্ণ বোরখায় দেহ আবৃত করিয়া, কে যেন আমার দিকেই আসিতেছে।

(১৭)

আমি সভয়ে, সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া বলিলাম, "কে তুমি? কেন তুমি আমার অনুসরণ করিতেছ?"

সেই মূর্ত্তি আমার খুব কাছে আসিয়া বলিল—"আলি মনসুর সাহেব! আমার সঙ্গে এস?"

এ আমার নাম জানিল কিরূপে? আর এ কণ্ঠস্বর যে রমণীর।

আমি বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে বলিলাম "কে তুমি বিবি?"

সেই রমণী বলিল—"পরিচয় পরে দিব। লতিফার নাম করিয়া তুমিই কি এইমাত্র বিলাপ করিতেছিলে?"

আমি। হাঁ—

রমণী। লতিফাকে দেখিতে চাও ত বিনা সঙ্কোচে নির্ভয়ে আমার অনুসরণ কর।

আমি। লতিফা কি প্রাণে বাঁচিয়া আছে ?

রমণী। এখানে দাঁড়াইয়া তোমার সকল কথার জবাব দিতে আমি প্রস্তুত নহি। জাননা কি তুমি, এই সব পিরামিড্, মধ্যনিশীথে, সুল-তানের প্রহরী-বেষ্টিত থাকে। তাহারা তোমাকে এখানে দেখিতে পাইলেই তস্করজ্ঞানে হত্যা করিবে। সুলতানের চির প্রচলিত আদেশ, রাত্রি প্রথম প্রহরের পর এখানে কাহারও আসিবার হুকুম নাই।

মনে ভাবিলাম—"এই স্ত্রীলোকের পশ্চাৎবর্ত্তী হওয়ায় ভয় কিসের ? লতিফা, আমার প্রেমপ্রতিমা লতিফা, এখনও কি জীবিতা আছে ? এর সঙ্গে গেলে কি তাহাকে আমি দেখিতে পাইব ? হোক সহস্র বিপদ ! যাক্ এ ছার জীবন ! মুছিয়া যাক্ জগতের বুক হইতে আমার মত এক হতভাগ্যের অস্তিত্ব ? অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, আমি ইহার সঙ্গে যাইব।"

আমি কৃতজ্ঞতা পূর্ণ স্বরে বলিলাম—"কে তুমি হিতকারিণি ! দেব-দূতীর মত আমায় আশা দিতে আসিয়াছ ?"

সেই রমণী বলিল—"সাহেব। আমি নিঃস্বার্থ উপকারিণীরূপে এখানে আসি নাই। ঘটনাচক্রে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। অন্যকার্য্যের জন্য আমি এখানে আসিয়াছিলাম। সে কাজ সারিয়া, আমি এই পথেই চলিয়া যাইতেছিলাম। সহসা তোমার মুখে লতিফার নাম শুনিয়া আমি তোমার

সম্মুখীন হইয়াছি। আমি তোমাকে চিনি। না চিনিলে তোমার নাম ধরিয়া ডাকিতাম না। এখনি এই. ভয়ানক স্থান হইতে চলিয়া এস! আমি এক নিরাপদ স্থানে গিয়া তোমায় সকল কথা বলিব।"

আমি ইহার উপর আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলাম না। নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে সেই অন্ধকারবেষ্টিতা রমণীর অনুবর্ত্তী হইলাম।

আমরা দুজনেই নির্ব্বাক অবস্থায় পথ চলিতেছিলাম। সে অগ্রে, আমি পশ্চাতে। সহসা আমি মৌন ভঙ্গ করিয়া বলিলাম, "বিবি! আমি যে সরাইখানায় আছি, তাহা খুব নিকটে। স্থানটী ও অতি নির্জ্জন। নিজের বাড়ীর মত সকল সুবিধাই আমি সেখানে ভোগ করিয়া থাকি। যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমার বাটীতেই চল।"

সে আমার প্রস্তাবে অসম্মত হইল না। বিনা বাক্যব্যয়ে, আমার পশ্চাৎবর্ত্তিনী হইল।

নির্জ্জন কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে আমি এক সুখাসনে বসাইলাম। বলিলাম—"বিবি! তোমার এ মেহেরবাণীর জন্য, আমার অসংখ্য ধন্যবাদ গ্রহণ কর। কিন্তু তুমি কে?"

সে বলিল—"আমি লতিফার এক বিশ্বস্ত বাঁদী। খালি তাই নয়, আমি তাহাকে কন্যার মত স্নেহ করিতাম। সেও আমাকে মায়ের মত দেখিত। তাহার সুখদুঃখের সকল কথাই সে আমায় বলিত। সুলতান তাহাকে বিবাহ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন।. কিন্তু লতিফা মুখে প্রসন্ন

ভাব দেখাইলেও, সুলতানকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত। তারপর তোমার সহিত তাহার মিলন। এ মিলন ব্যাপারে, আমিই তার প্রধান সহায় ছিলাম। তারপর লতিফার শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, সবই তুমি জান।”

সাহেব! খোদা যাহাকে রক্ষা করেন, তাহাকে মারে কে? লতিফা যখন নীল নদের সলিলে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন খোদাই তাহাকে বুকে লইয়া তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। ধীবরেরা তাহাকে নদীগর্ভ হইতে উদ্ধার করে। তারপর সে ঘটনাচক্রে আবার সমশের জঙ্গের হস্তগত হয়। কিন্তু এবার খোদা তাহার উপর নারাজ হইলেন। এজন্য সে মরিল!”

আমি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম—“তাহা হইলে লতিফা মরিয়াছে?”

বাঁদী বলিল—“হাঁ—সাহেব সে মরিয়াছে! কিন্তু মরণের পর সে বাঁচিয়াছে।”

আমি। কে তাহার মৃত্যু ঘটাইল? কেই বা তাহাকে বাঁচাইল?

বাঁদী। কায়রোর শাসনকর্ত্তা এই সমশের জঙ্গ। পূর্ব্বেইত বলিয়াছি সমশের জঙ্গ তাহাকে ধীবরের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া, নিজ গৃহে লুকাইয়া রাখেন। এই সমশের জঙ্গ কায়রোর শাসনকর্ত্তা। সুলতানের নিম্নেই তাঁহার ক্ষমতা। সুলতানের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ তিনি। সমশের জঙ্গ, লতিফার উদ্ধার ব্যাপার সুলতানের কর্ণগোচর না করিয়া প্রচ্ছন্ন

ভাবে তাহাকে নিজের উদ্যানবাটিতে লুকাইয়া রাখেন। আপনি যে পিরামিডের চাতালে বসিয়াছিলেন—সে স্থান হইতে এই উদ্যান বাটী খুব নিকটে!

বোধ হয় লতিফার অনুরোধেই—তিনি আমাকে তাঁহার উদ্যান বাটীতে, বাঁদীর কাজ করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠান। লতিফার রক্ষার ভার আমাকে দিয়াই নিশ্চিন্ত হন। এই ভাবে একমাস কাটিয়া যায়।

লতিফা, আপনাকেই তাহার স্বর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ভাল বাসিয়াছিল, সুতরাং সে সমশেরজঙ্গের এই আনুগত্য ভাব দেখিয়া বড়ই শঙ্কিতা হইল।

সমশের বহুদিন হইতেই লতিফার রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মহাপরাক্রান্ত সুলতানের প্রণয়িনী—এই লতিফা। সমশেরজঙ্গ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য চালিত হইয়াই, লতিফাকে নীল নদে ভাসাইয়া দিবার জন্য, সুলতানকে পরামর্শ দেন। লতিফাকে নদগর্ভ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, তিনি গোপনে লোক পাঠাইয়া ছিলেন। কিন্তু তাহারা লতিফাকে উদ্ধার করিতে পারে নাই। তৎপরে ভবিতব্যের সহায়তায়, এক অভূতপূর্ব্ব উপায়ে, এই নিরাশচিত্ত সমশেরজঙ্গ লতিফার সন্ধান পান। সুলতানকে না জানাইয়া তিনি লতিফাকে নিজের আলয়ে আনিয়া রাখিয়াছিলেন, এজন্য তিনি মনে মনে বড়ই শঙ্কিত ছিলেন।

ইহার পর একদিন সেরাজীর ঝোঁকে, অধীরচিত্তে, লালসাপূর্ণ হৃদয়ে, সমশেরজঙ্গ লতিফার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন। তখন আমি সেই কক্ষে বসিয়া লতিফার সহিত গল্প করিতেছিলাম।

সমশেরজঙ্গকে সেইভাবে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, লতিফা বড়ই ভয় পাইল। ব্যাপারটা কোথায় দাড়ায়, দেখিবার জন্য আমি প্রচ্ছন্নভাবে দ্বারপ্রান্তে আসিয়া লুকাইলাম।

সমশেরজঙ্গ লতিফার পার্শ্বস্থ এক সোফায় বসিয়া, সহাস্যমুখে প্রশ্ন করিলেন—"লতিফা! কেমন আছ?"

লতিফা বলিল—"জনাব যেমন রাখিয়াছেন।"

সমশের। আর কতদিন বৃথা আশা পোষণ করিব?

লতিফা। কিসের আশা জনাব?

সমশের। আমি তোমায় চাই।

লতিফা। আর আপনার প্রভু মিশরের সুলতানও আমায় চান।

সমশের। তুমি জান—সুলতান এই মিশররাজ্যের কেহই নহেন; আমিই সর্ব্বেসর্ব্বা। আমি না থাকিলে এ রাজ্যশাসন করা, তাঁর পক্ষে অতি অসম্ভব হইত। ধরিতে গেলে, আমিই প্রকৃতপক্ষে মিশরাধিপ; তোমার মৃত্যুর রাত্রে, তাহার প্রমাণ পাইয়াছ তো! আমার বিরুদ্ধে কোন কথা কহিবার শক্তি সুলতানের নাই।

লতিফা। কিন্তু জনাব! সুলতান ত তাহা বলেন না—তিনি বলেন আপনি তাঁর গোলামের গোলাম।

সমশেরজঙ্গ এ কথায় ভয়ানক রাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"লতিফা? কে তোমাকে একথা বলিল?

লতিফা। স্বয়ং সুলতান!

সমশের। বটে! সব কথা এখন থাক্। এ সম্বন্ধে বোঝাপড়া করিতে হয়, আমি সুলতানের সঙ্গেই করিব। কিন্তু এখন আমি যা বলিলাম —তার কি?

লতিফা। আপনি যদি সুলতানকে রাজি করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার অঙ্কলক্ষ্মী হইতে আমার কোন আপত্তিই নাই জনাব!

সমশের। কিন্তু সুলতানের চক্ষে তুমি মৃত!

লতিফা। ছিলাম বটে! কিন্তু আজ মধ্যাহ্ন হইতে নয়। আমি ঐ উদ্যানের বাতায়নপথে দাঁড়াইয়া ছিলাম। সুলতান, তাঁহার দলবল লইয়া শিকারে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আমার চোখাচোখি হইবা মাত্র, তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন। মরণের পর, আমাকে জীবন্ত মূর্ত্তিতে এখানে দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন।

সমশের। বল কি?

লতিফা। যাহা সত্য—তাহাই বলিতেছি। আমাকে দেখিয়াই তিনি গবাক্ষনিম্ন হইতে তাহার অঙ্গুরীয়টী উপরের কক্ষমধ্যে নিক্ষেপ করেন। আপনি সে অঙ্গুরীয় দেখিতে চান্ কি?

লতিফার মনের উদ্দেশ্য আমি জানিতাম। সে সুলতানের ভয় দেখাইয়া, যতদিন সমশেরকে দূরে রাখিতে পারে, তাহাই তাহার লাভ।

যে অঙ্গুরীয়ের কথা সে বলিল—সত্যই তাহা সুলতানের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়! লতিফা যখন কায়রো রাজপ্রাসাদে থাকিত, সুলতান সেই সময়ে তাহাকে সেই অঙ্গুরীয়কটী দান করেন।

লতিফা তাহার অঙ্গুলী হইতে সেই আংটীটি খুলিয়া, সমশেরজঙ্গের হাতে দিল। সমশের তাহা দেখিবামাত্রই দেশাধিপ স্থলতানের অঙ্গুরীয় বলিয়া চিনিতে পারিলেন।

সমশেরের মুখমণ্ডল ক্রোধে লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। তিনি সেই অঙ্গুরীয়কটী ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত মাটীতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তখনই লতিফার কক্ষত্যাগ করিলেন। যাইবার সময়, অস্ফুটস্বরে বলিয়া গেলেন—“স্থলতান মনে ও ভাবিও না, আমি সহজে এই লতিফাকে তোমার হস্তে তুলিয়া দিব।”

সমশের স্থানত্যাগ করিলে—আমি লতিফার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম। তাহাকে বলিলাম—“লতিফা বিবি! কাজটা কি ঠিক হিসাবমত হইল?”

লতিফা হাসিয়া বলিল—“কাজটা বে-হিসাব হইলই বা কিসে? দুই দুইটা শয়তান আমার পিছনে লাগিয়াছে। দুইটারই প্রকৃতি শোণিত-লোলুপ হিংস্রজন্তুর মত। শিকারের জন্য দুটোতেই যদি লড়াই করিয়া মরে, তাহা হইলে আমারই স্থবিধা। আজ মিথ্যা কথা বলিলাম বটে, কিন্তু কাল প্রভাতে তোমারই হাত করিয়া এই অঙ্গুরীয় ও একখানি পত্র আমি স্থল তানকে পাঠাইয়া দিব। ইহাতেই চারিদিক হইতে আগুণ জ্বলিয়া উঠিবে।”

আমাদের কথোপকথন শেষ হইবামাত্রই দেখিলাম যে বাঁদী নিত্য লতিফার খাবার লইয়া আসে, সে সেই কক্ষমধ্যে উপস্থিত। খাবার দ্রব্য-গুলি যথাস্থানে রাখিয়া সে চলিয়া গেল।

লতিফার জন্য যে খাদ্য নিত্য আসিত, তাহা সমশের জঙ্গের নিজের আহার্য্য হইতেই প্রেরিত হইত। লতিফা একা সব খাইতে পারিত না। কেননা যাহা আসিত—তাহাতে তিনজনের চলে। কাজেই প্রতিদিনই লতিফা আমার সহিত তাহার খাদ্যগুলি সমান ভাবে বণ্টন করিয়া খাইত।

সেদিনও তাই হইল। আমরা বিনা সন্দেহে, সেই খাদ্যগুলি উদরস্থ করিলাম। কিন্তু সরবৎ পানের পরই, আমাদের দুইজনের দেহ যেন অবসন্ন হইয়া আসিল। আমি দেখিলাম—লতিফা তাহার শয্যার উপর ঢলিয়া পড়িয়াছে। মনে ভাবিলাম—নিশ্চয়ই এই সরবতের মধ্যে কোনও কিছু তীব্র মাদক মিশানো ছিল। নরপিশাচ সমশেরেই এই কাণ্ড।

আমায় আর বেশীক্ষণ ভাবিতে হইল না। আমিও লতিফার মত সংজ্ঞাহীন হইয়া মাটীতে শুইয়া পড়িলাম।

পরদিন যখন আমার চেতনা হইল—দেখিলাম লতিফা সে কক্ষমধ্যে নাই। চারিদিকে তাহাকে খুঁজিলাম, কোথাও দেখিতে পাইলাম না। দাসী বাঁদিদের জিজ্ঞাসা করিলেও কেহ কোন কথা বলে না। ভাবিলাম, এই সমশেরজঙ্গ, লতিফাকে কি উদ্যানবাটীর অন্য কোন কক্ষে লুকাইয়া রাখিয়াছে—না লতিফা আর কোথাও চলিয়া গিয়াছে? কিম্বা সুলতান তাহাকে লইয়া গিয়াছেন?

সমশের সাহেবের উদ্যানবাটীর সমস্ত কক্ষগুলি খুঁজিয়া,আমি লতিফার কোন সন্ধানই পাইলাম না। আমার প্রাণের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। সুলতানের প্রাসাদে গেলাম। সেখানেও গুপ্তভাবে অনুসন্ধানে

জানিলাম, লতিফা সেখানেও নাই। সুলতানের মহলে, লতিফার সম্বন্ধে প্রকাশ্য ভাবে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার যো নাই বটে, কিন্তু মহলের সকল অংশেই আমার অবাধ গতি। সুতরাং এই ভাবে অনুসন্ধানের জন্য একটুও বাধা পাইলাম না। বুঝিলাম—লতিফা মহলের কোন স্থানেই নাই। তবে গেল কোথায়?

তিনদিন পরে, সমশের জঙ্গের এক খোজার নিকট আমি লতিফা সম্বন্ধে যে গুপ্ত সংবাদ পাইলাম, তাহা অতি ভীষণ। অতি শোচনীয়। এই খোজাকে সমশের জঙ্গ সামান্য অপরাধে প্রহার জর্জ্জরিত করিয়া জবাব দিয়াছিলেন। এজন্য সে তাহার উপর বড়ই বিরক্ত ছিল। লতিফাকে সে খুব ভালরূপেই জানিত। সেই একদিন আমায় নির্জ্জনে বলিল—"লতিফা বিবিকে যদি অন্য মূর্ত্তিতে দেখিতে চাও ত আমার সঙ্গে এস।"

আমি তাহার সঙ্গে উদ্যান হইতে বহুদূরে, এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপত্যকার মধ্যে গেলাম। সে আমাকে একটি নূতন সমাধি দেখাইয়া বলিল—"ইহাই তোমার লতিফার সমাধি! শাসনকর্ত্তা সমশের জঙ্গ তাহাকে অচেতন অবস্থায় আনিয়া দুইজন খোজার সহায়তায় এই সমাধি মধ্যে পুতিয়াছে। স্বচক্ষে আমি ইহা দেখিয়াছি। সুলতান লতিফাকে যে আবার কাড়িয়া লইবেন—তাহা সে সহিতে পারিবে না বলিয়াই এই মহানিষ্ঠুরের কাজ করিয়াছে।"

কথাটা শুনিয়াই, আমি সকল ব্যাপারই বুঝিতে পারিলাম। লতিফার পত্র পাইবার পর, সুলতান পাছে তাহাকে বলপূর্ব্বক নিজ প্রাসাদে লইয়া

যান, এই ভয়ে, নিরাশার আক্রোশে, এই নিষ্ঠুর হৃদয় কায়রোর শাসন-কর্ত্তা সমশেরজঙ্গ, লতিফাকে সরবতের সহিত বিষাক্ত মাদক দিয়া নিহত করিয়া, তাহাকে এইস্থানে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় প্রোথিত করিয়াছে।

মনসুর সাহেব! এ ঘটনা ঘটিয়াছে তিনমাস পূর্ব্বে। কিন্তু আমি এখনও লতিফার মায়া কাটাইতে পারি নাই। সুবিধা পাইলেই—এই পাহাড়ের উপত্যকায় আসিয়া তাহার সমাধিটী একবার করিয়া দেখিয়া যাই। সমাধির পার্শ্বে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলে আমার বুকের বেদনাটা যেন কমিয়া আসে। আপনি যেস্থানে বসিয়া লতিফার নামোচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেস্থান হইতে এই সমাধির দূরত্ব খুব নিকটে। আর এই নির্জ্জন স্থানে আপনার মুখে লতিফার নামোচ্চারিত হইতে শুনিয়াই আমি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম।”

লতিফার এই শোচনীয় পরিণাম কাহিনী শুনিয়া আমার চিত্ত থরথর কাঁপিয়া উঠিল। সর্ব্বশরীর অবসাদময় হইল। আমি সেইস্থানে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

চেতনা হইলে দেখিলাম, সেই দয়াবতী বাঁদী আমার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতেছে। সরাই-রক্ষকের সাহায্যে সে একজন হকিম আনাইয়া, আবার আমাকে চেতনার সীমায় ফিরাইয়া আনিয়াছে।

আমি তাহাকে বলিলাম—“তুমি যাহা করিয়াছ, তাহার জন্য আমি বড়ই কৃতজ্ঞ। কিন্তু, কেন তুমি আমায় বাঁচাইলে? লতিফার এই শোচনীয় পরিনাম শুনিবার পর, আমার মৃত্যু হওয়াই শ্রেয়ঃ ছিল।”

সেই বাঁদী বলিল—"সাহেব! নিয়তির লিখন কেহ ত খণ্ডন করিতে পারে না। ভালবাসা অপেক্ষা ভালবাসার স্মৃতি যে মহাবিরহের মহাসান্ত্বনা। যাহাকে আর ইহলোকে পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাহার জন্য বৃথা বিলাপে ফল কি? বরঞ্চ খোদার কাছে নিত্য প্রার্থনা করুন, যেন লতিফার মুক্ত আত্মা, পরম শান্তিতে লোকান্তরে থাকিতে পায়।"

মনে ভাবিলাম, খোদা আমাকে লতিফারূপ রত্নলাভের অধিকারী করেন নাই। তাহা না হইলে, সে মরিয়া বাঁচিবে কেন? আর অদ্ভুত উপায়ে জীবন লাভ করিয়াই বা আবার মরিবে কেন?

আমি ভাবিলাম, এই বাঁদী যাহা বলিয়াছে, তাহাই ঠিক। স্বার্থশূন্য ভালবাসাই প্রকৃত প্রেম। লতিফাকে ইহজীবনে পাইলাম না বলিয়া যে তাহকে ভুলিয়া যাইব—খোদা যেন আমার এরূপ মতিগতি না করেন। নির্জ্জনে বসিয়া তাহার মূর্ত্তি ধ্যান করিব, অন্ধকারময় হৃদয়মন্দিরে তার স্নেহময়ী, কান্তিময়ী, প্রাণময়ী প্রতিমা—স্মৃতিরআলোকে চির উজ্জ্বল করিয়া রাখিব—আমার সমস্ত স্নেহ যত্ন মায়ামমতা তাহার উপর ঢালিয়া দিব। ইহাই তখন আমার চরম লক্ষ্যে দাঁড়াইল। ভাবিলাম—খোদার বিধানে যতদিন ইহলোকে থাকিব ততদিন এইভাবে কাটাইয়া লোকান্তরে লতিফার সহিত মিলিত হইব। সে মিলনে অত্যাচার নাই, হিংসা নাই, বিরহ নাই। সে মিলনের শত্রু নাই। সে মিলন অফুরন্ত, অনন্ত। সেখানে সুলতান নাই, সমশের নাই—যে আমাদের অবাধ মিলনের শান্তি ভঙ্গ করিতে পারে।

আমি বাঁদির হাত দুটী ধরিয়া মিনতির সহিত বলিলাম—"তুমি

একবার আমাকে সেই সমাধিস্থানে লইয়া চল। লতিফার এই শোচনীয় পরিণামে, আমার বুকে একটা মহা ঝড় উঠিয়াছে। তাহার সমাধির উপর খুব খানিকটা অশ্রুপাত করিলে, হয়ত আমার প্রাণের এ ভীষণ ঝটিকা, কতকটা শান্তভাব ধারণ করিবে।”

পরদিন অতি প্রত্যূষে, আমি পূর্ব্বোক্ত উপত্যকা মধ্যে, সেই বাঁদির সঙ্গে, লতিফার সমাধিপার্শ্বে উপস্থিত হইলাম। সে সমাধি স্পর্শ মাত্রেই, আমার দেহ শিহরিয়া উঠিল। সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎস্রোত বহিল। অতীতের সকল কথাই আমার মনে জাগ্রত স্বপ্নের মত বোধ হইল। আমি প্রাণ ভরিয়া, সেই সমাধিপার্শ্বে বসিয়া কতশত নিশ্বাস ফেলিলাম—কতবার “লতিফা” “লতিফা” বলিয়া মহাশূন্য বিকম্পিত করিয়া চীৎকার করিলাম। কিন্তু হায়! কোথায় লতিফা! কে আমার কথার উত্তর দিবে? আমি লতিফার পবিত্র সমাধির মৃত্তিকা, আমার উষ্ণীষে বাঁধিয়া লইয়া, সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। পরদিনই আমি কায়রো ত্যাগ করিলাম। কায়রোর স্মৃতি তখন আমার পক্ষে যেন অতি যন্ত্রণাদায়ক বোধ হইল। বসোরায় ফিরিয়া আসিয়া, সর্ব্বপ্রথমেই আমি আমার পিতৃবন্ধু সেই মহাজনের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

মহাজন আমাকে সহসা বসোরায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া, বড়ই সুখী হইলেন। তিনি বলিলেন—“বৎস! প্রতিদিনই আমি তোমার প্রত্যাগমনের আশা প্রতীক্ষা করিতেছি। এতদিন তুমি ছিলে কোথায়?”

আমি আমার জীবনের শোচনীয় ঘটনাগুলি, তাঁহাকে গুছাইয়া

বলিলাম। তিনি শুনিয়া বড়ই বিমর্ষ হইলেন। একথা সে কথার পর, তিনি আমায় বলিলেন "মন্‌সুর! আমার পুত্রসন্তান নাই, কিন্তু যথেষ্ট ধন সম্পত্তি আছে। তোমার পিতা আর আমি, দুইজনেই যেন একমাতৃগর্ভ-জাত সন্তান ছিলাম। এই অর্থ উপার্জ্জনের জন্য, আমরা বনেজঙ্গলে মরু-ভূমিতে, পর্ব্বতের গুহায়, প্রাণ হাতে করিয়া ঘুরিয়াছি। তোমার পিতা একবার আমাকে বাঘের মুখ হইতে বাঁচাইয়াছিলেন। তিনি যদি এই সময়ে আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন না করিতেন, তাহা হইলে আজ আমি এই কুবেরের ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতাম না। তোমার পিতার মৃত্যুর সময় আমি এদেশে ছিলাম না। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তোমার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি। তখন তুমি কায়রোতে ছিলে, এজন্য বসোরায় তোমার কোন সন্ধান পাই নাই। পরবৎসর বাণিজ্যার্থে বিদেশে চলিয়া গেলাম। তারপর এখানে আসিয়া শুনিলাম, যে তুমি সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছ। এজন্য তুমি যখন আমার কাছে আসিয়া, বাণিজ্য উদ্দেশে বিদেশে যাইবার প্রস্তাব করিলে, তাহাতে আমি কোন আপত্তিই করিলাম না। কিন্তু তোমার দ্বিতীয় যাত্রার ফল দেখিতেছি, অতি শোচনীয়। তুমি সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া রিক্ত হস্তে বসোরায় ফিরিয়া আসিয়াছ। আমি সংকল্প স্থির করিয়াছি, তোমায় দত্তক-পুত্র রূপে গ্রহণ করিব। তোমার নামে আমি সমস্ত সম্পত্তি লেখাপড়া করিয়া রাখিয়াছি। একটী সুন্দরী পাত্রী সংগ্রহ করাও আমার পক্ষে দুর্ঘট হইবে না। বৎস! বিবাহ করিতে তুমি সম্মত আছ কি না?"

আমি তাঁহাকে বিনয়নম্র বচনে, করজোড়ে বলিলাম—"আপনি পিতৃতুল্য। সকল কথাই একটু আগে আমি আপনাকে খুলিয়া বলিয়াছি। কিরূপ শোচনীয় ঘটনার মধ্যে পড়িয়া, আমার জীবনের সুখ শান্তি নষ্ট হইয়াছে, তাহার সবই আপনাকে জানাইয়াছি। এরূপস্থলে আমি আপনার নিকট মার্জ্জনা ভিখারী। আর আমি সংসারী হইতে চাহি না।"

আমার মনের অবস্থা বুঝিয়া তিনি বিবাহ সম্বন্ধে আমায় বেশী পীড়াপীড়ি করিলেন না। তৎপর দিন তিনি কাজির নিকট আমাকে লইয়া গিয়া, তাঁহার পরিত্যক্ত সমস্ত বিষয় সম্পত্তি, আমার নামে লেখা পড়া করিয়া দিলেন।

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে তিনি একদিন আমাকে বলিলেন—"মনসুর! সংসারের সহিত আমার সকল সম্পর্ক লোপ হইয়াছে। উপযুক্ত সঙ্গী পাইয়াছি, কালই আমি মক্কা-সরিফে হজব্রত পালনের জন্য গমন করিব। আজ রাত্রেই বসোরা ত্যাগ করিয়া বাগদাদে গিয়া থাকিব। তোমায় আর বেশী কি বলিব বৎস! পুত্রাধিক তুমি আমার। ভবিষ্যতে বিবাহ করিয়া সংসারী হইও। আর আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তিগুলিকে তোমার জীবনের শোণিত তুল্য বলিয়া বিবেচনা করিও!"

আমি তাঁহাকে সংসারে থাকিবার জন্য অনেক বুঝাইলাম, কিন্তু তিনি আমার কোন কথাই কাণে তুলিলেন না।

তিনি চলিয়া গেলেন। সেই বিশালপুরীর মধ্যে রহিলাম—আমি একা। চারি দিকে বিরাট শূন্যতা। সজ্জিত নির্জ্জন কক্ষ, যেন দাবানলের যন্ত্রণাময়। বাঁদীদের হাস্যালাপ ও সঙ্গীতধ্বনি পূর্ণমাত্রায় বিষবৎ!

বান্দাদের জনাব সম্বোধন, যেন বিদ্রুপ মাখা। আলোকোজ্জ্বল বিশাল পুরী, যেন সমাধি-ক্ষেত্রের মত ঘোরান্ধকারময়। আমার চিত্তের তখন এতটা পরিবর্ত্তনই ঘটিয়াছিল।

নির্জ্জনতাই তখন আমার স্পৃহনীয়। আমার প্রাণের প্রাণ, জীবনাধিকা লতিফার সেই পবিত্র-মূর্ত্তির ধ্যানই, আমার জীবনের লক্ষ্য।

নির্জ্জনে বসিয়া, লতিফার সহিত আমার ঘটনাময় মিলনের সমস্ত কথাই আলোচনা করি। তাহার অতি শোচনীয় পরিণাম স্মরণ করিয়া, ভয়ে শিহরিয়া উঠি। মনে যখন ভাবি, যে আমিই তার এই শোচনীয় মৃত্যুর কারণ আমার পাপেই সে মরিল, তখন অনুশোচনায় তীব্র যন্ত্রণায় অধীর হইয়া আমি জ্বালার চোটে ভূমে লুটাইতে থাকি।

এই সময়ে আমার মনে নির্জ্জনবাসের একটা কামনা বড়ই প্রবল হইল। জন্মের মত বসোরা ত্যাগ করিতে, আমি কৃতসংকল্প হইলাম।

একদিন উদাসমনে ঘুরিতে ঘুরিতে, আমি টাইগ্রীসের অপর তীরবর্ত্তী এক জনশূন্য ক্ষুদ্র পাহাড়ের নির্জ্জন উপত্যকায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, স্থানটী একাবারে জনসমাগমহীন। ভাবিলাম—এইখানে জীবনের শেষভাগ যাপন করিতে পারিলে, আমি শান্তির অধিকারী হইতে পারিব। নির্জ্জনে লতিফার মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া, মনে একটা আনন্দ অনুভব করিতে পারিব।

পরদিন হইতেই, আমি সেই পাহাড়ের এক নিভৃত গুহার মধ্যে, এক ক্ষুদ্র পুরী নির্ম্মাণের কাজ সুরু করিয়া দিলাম। নদীর অপর পারে

বলিয়া, সেই স্থানটী বসোরা সরকারের খাস দখলভুক্ত নহে। আমি সেই উপত্যকা ও বনপ্রদেশের অধিকারী, গ্রাম্য জমিদারের নিকট হইতে সেই পাহাড়ের উপত্যকার মধ্যবর্ত্তী কতকটা স্থান কিনিয়া লইয়া, ছইমাসের মধ্যে সেখানে এক নির্জ্জন "তয়খানা" প্রস্তুত করিলাম। সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, একদিন রাত্রিকালে বসোরা হইতে দরবেশের বেশে চিরজন্মের মত বাহির হইয়া গেলাম! কেহই জানিল না, যে আমি কোথায় গিয়াছি।

এই নির্জ্জন গুহার মধ্যে কয়েকটী বাসযোগ্য কামরা নিম্মাণ করিলাম। নিজের সেবাশুশ্রুষার জন্য, উদরান্নের জন্য, চারিজন বাঁদি রাখিলাম! সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, আমি লক্ষাধিক টাকা পাইয়াছিলাম। তাহার অর্দ্ধেক অংশ দান খয়রাতের জন্য, একদিন অতিগোপনে এক ধম্মশালায় দিয়া আসিলাম। কেবল আমার দীর্ঘ জীবনযাত্রায় নিতান্ত প্রয়োজনীয় কিছু অর্থ, আমার সঙ্গে রহিল।

লতিফার কবর হইতে, আমি যে মৃত্তিকাটুকু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম—তাহা লইয়া সেই উপত্যকার এক নিভৃতাংশে আর একটা নূতন কবর নির্ম্মাণ করিলাম। এটা কেবল আমার প্রাণের শান্তি ও কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য। দিবাভাগে আমি শাস্ত্র-গ্রন্থাদি পাঠে কাটাইতাম। গভীর রাত্রে তয়খানা হইতে বাহির হইয়া, আমি এই নবরচিত সমাধিপার্শ্বে বসিয়া নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতাম। এই সমাধিকে সুগন্ধ গুলাববারিতে পরিধৌত করিয়া, তাহার পার্শ্বে

লোবানের আগরের ও সুগন্ধ দীপ জালিয়া দিতাম। লতিফার আত্মার মঙ্গল কামনায়, কোরাণ-শরীফের কয়েকটা শ্লোক নিত্যই পাঠ করিতাম। তার পর, প্রাণের জ্বালায় আমার সর্ব্বনাশের মূল, এই সমশেরজঙ্গকে অভিশাপ প্রদান করিতাম। বলুন জাঁহাপনা! ইহাতে আমার কি অপরাধ?"

নওশেরজঙ্গ আমার জীবনের এই অতি শোচনীয় বিচিত্র ঘটনাগুলি শুনিয়া বড়ই বিমর্ষ হইলেন। তিনি আমাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "মনসুর! আজ হইতে আমি তোমার "দোস্ত" হইলাম। তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি নিজ ব্যয়ে এই বসোরা মধ্যে লতিফার পবিত্র স্মৃতি রক্ষার জন্য নিজব্যয়ে এক মঞ্জিল নির্ম্মাণ করিয়া দি।"

আমি করজোড়ে বলিলাম—"আপনার সহোদরের নামে অভিশাপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া আমিই জাঁহাপনার নিকট অপরাধী হইয়া পড়িয়াছি। জনাব যখন সে অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমার মত নরাধমকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়াছেন, আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট পুরস্কার হইয়াছে! সুলতান! এই নির্জ্জন সমাধির পার্শ্ববর্ত্তী গুহা-নিবাসই আমার পক্ষে অতি শান্তিময়। এই গুহাবক্ষে স্থাপিত, লতিফার ক্ষুদ্র সমাধিই তাহার নির্জ্জন কীর্ত্তি মন্দির। যদি আমার এই কাহিনী আপনার হৃদয়ে একটুও করুণার প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিয়া থাকে, তাহাহইলে আজ আমায় বিদায় দিন।"

কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর সুলতান বলিলেন—"আলি মনসুর! তোমার অন্যান্য অনুরোধ গুলি রক্ষা করিতে আমি অসম্মত নই, কিন্তু আজ আমি তোমাকে কখনই ছাড়িতে পারি না। জানতো তুমি কালরাত্রে আমি

তোমার গৃহে অতিথিরূপে যথেষ্ট আদর পাইয়াছিলাম। যদিও শত্রুরূপে আমি তোমার অতিথি হইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মহত্ত্বে তুমি চিরমিত্রের অধিক সম্মান আমাকে দিয়াছ। আজ আমি তোমাকে দোস্ত বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছি। সুতরাং এই দোস্তের গরীবখানায় আতিথ্য-গ্রহণে, বোধ হয় তোমার কোন আপত্তিই হইবে না। বসোরাধিপের উপযুক্ত আতিথেয়তার অনুষ্ঠান আমি কালই করিব। একটা দিন মাত্র তুমি এ প্রাসাদে অবস্থান কর।"

আমি সুলতানের এ প্রস্তাবে কোন আপত্তি করিতে পারিলাম না। নতজানু হইয়া তাঁহার বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিয়া, প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। সে দিন চলিয়া গেল। পরদিনের রাত্রি আসিল। তখন জানিতাম না, এই রজনী আমাকে চিরসুখ, চিরশান্তি, চির আনন্দ আনিয়া দিবে। আমার প্রাণের নিভৃতাংশে সঞ্চিত, দুর্লভ আশা পূর্ণ হইবে। অসম্ভব সম্ভব হইবে—বর্ষায় বসন্তের মৃদু হিল্লোল উঠিবে। কেন তাহা পরে বলিতেছি।

(১৮)

দিন গেল। রাত্রি আসিল। এ রাত্রি আলোকমালা বিভূষিতা, উৎসবময়ী, আনন্দময়ী। বহুদিনের পর আমার চিরআঁধার জীবনে, আনন্দের সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল।

সুলতানের নিজের বিলাসকক্ষটী সেদিন যেন আরও সুন্দরভাবে

সুসজ্জিত। নিত্য তাহাতে যতগুলি বাতি জ্বলে, সেদিন তাহার দ্বিগুণসংখ্যা বত্তিকা জ্বালা হইয়াছে সেই আলোকে সমস্ত কক্ষ দিবালোকের ন্যায় সমুজ্জ্বল।

স্তম্ভে স্তম্ভে দোলায়িত—বসোরার সুপ্রসিদ্ধ গুলাবের মালিকা কক্ষের সর্ব্বত্রই ইস্তাম্বুলের সুবাস পূর্ণ করিয়াছে! সুগন্ধি দীপের সুগন্ধের সহিত মিশিয়া, সেই ইস্তাম্বুলের গন্ধ, যেন অতিরিক্ত মাত্রায় চিত্তোন্মাদকর হইয়া উঠিয়াছে।

কক্ষের মর্ম্মরময় হর্ম্ম্যতলে, খুব পুরু বস্‌রাই গালিচা পাতা। সেই গালিচার উপর গুলাবের পাপড়ি দিয়া গমনপথ সাজানো। রাশি রাশি গুলাবের পাপড়িগুলি দিয়া কৃত্রিম পথ রচিত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, কেমন করিয়া মমতাহীন গোলামগণ এই সব সুন্দর গুলাবের সার সম্পত্তি, নির্ম্মমের মত পায়ে দলিয়া যাইবার জন্য ছড়াইয়া রাখিয়াছে।

কতকগুলি গুলাব পাপড়ি, বৃত্তাকারে সেই গালিচার মধ্যখানে সাজানো রহিয়াছে। এমন কৌশলের সহিত সেগুলি সাজানো হইয়াছে—যে তাহার মধ্যে আরবীতে যে ক্ষুদ্র কবিতাটী লেখা আছে, তাহা স্পষ্টই পড়া যায়। ফুলের পাপড়ি কৌশলে সাজাইয়া, যে অক্ষরগুলির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই—"হে সম্মানিত অতিথি! তোমার পদস্পর্শে পবিত্র হইবার জন্য, আজ আমরা এইভাবে এখানে পড়িয়া আছি। তোমার যদি প্রাণ থাকে, প্রাণে অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে অতি সন্তর্পণে আমাদের চরণ দলিত করিও।"

চারিদিকে মখমলমণ্ডিত সুখাসন। ইহার মধ্যে একটী স্বর্ণখচিত আসনে, স্বয়ং সুলতান—উপবিষ্ট। তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে প্রধান উজীর। খোজাগণ উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে দূরে অদূরে দণ্ডায়মান।

সুলতানের প্রধান সচিব, আমাকে সঙ্গে লইয়া, সেই সভাকক্ষে প্রবেশ করিলেন। সুলতান—আসন হইতে উঠিয়া, স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া, আমাকে তাঁহার পার্শ্বে বসাইলেন।

যাহা কিছু রসনাতৃপ্তিকর, ভোজের জন্য সেই সব জিনিসেরই প্রচুর আয়োজন হইয়াছে। সুলতান আমার হাত ধরিয়া, অতি সমাদরে আহার-গৃহে লইয়া গেলেন। আহারাদি শেষ হইলে—সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুলাবগন্ধ বস্‌রাই সেরাজি, আমাদের সকলেরই প্রাণে, সুখের ও উল্লাসের একটা নূতন তরঙ্গ প্রবাহিত করিল!

দেশাধিপ সুলতান—তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিলেন। আমি তাঁহার পার্শ্বে আসন পাইলাম। এই সময়ে সুলতান নওশের জন্য—তাঁহার প্রধান শরীররক্ষী আলমামুনকে, কি যেন একটা ইঙ্গিত করিলেন।

পার্শ্ববর্ত্তী একটী কক্ষে, সুলতানের পরমাসুন্দরী, সঙ্গীতকারিণী বাঁদী-গণ, অপেক্ষা করিতেছিল। আলমামুন তাহাদের সঙ্গে লইয়া আসিল।

তাহারা সঙ্গীত আরম্ভ করিল। সুকণ্ঠনিঃসৃত অমন মধুর সঙ্গীত, আর কখনও আমি শুনি নাই। তন্ময়চিত্তে সেই মধুমাখা সঙ্গীত শুনিতেছি, এমন সময়ে এক মহাবিভ্রাট উপস্থিত!

সহসা এক সুন্দরী বাঁদী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ায়, তখনই একটা মহা-

গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। সঙ্গীত বন্ধ হইয়া গেল। চারিদিকে একটা গোলমাল উপস্থিত হইল। সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষিত হইল।

"ব্যাপার কি?" বলিয়া, সুলতান আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিলেন। আমিও তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইলাম। আর সেই মুচ্ছিত বাঁদীকে দেখিবামাত্রই, আমি সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া বলিলাম—"লতিফা! লতিফা! তুমি! তুমি জীবিত? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?"

আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। আমি হতচেতনাবস্থায় ভূমে লুটাইয়া পড়িলাম। আমার মুখে লতিফার নামোচ্চারিত হইতে দেখিয়া, সুলতানও চমকিয়া উঠিলেন। বাঁদীদের বলিলেন—"লতিফাকে কক্ষান্তরে লইয়া গিয়া, তোমরা তাহার শুশ্রূষা কর। উহার চেতনা হইলেই আমায় সংবাদ দিও।"

ভৃত্যেরা বসোরাপতির আদেশে, আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। অতি অল্পক্ষণেই আমি সেই ধাক্কাটা সামলাইয়া উঠিলাম।

সুলতান গম্ভীর মুখে বলিলেন—"ব্যাপার কি মনসুর? তুমিও কি উন্মাদ হইলে? যে লতিফা জীবন্তে কবরমধ্যে প্রোথিত হইয়াছে—সে কি কখন এখানে আসিতে পারে? তুমি হয়তো এই বাঁদীর মুখের সহিত লতিফার মুখের কোনরূপ সাদৃশ্য দেখিয়া এইরূপ ভ্রমে পড়িয়াছ।"

আমি জোড়হস্তে বলিলাম—"জাঁহাপনা! এ বান্দার গোস্তাখি মাফ হউক। অন্য কাহারও সম্বন্ধে আমি ভ্রান্ত হইতে পারি, কিন্তু আমার জীবনানন্দদায়িনী এই লতিফার সম্বন্ধে নয়।"

এমন সময়ে একজন বাঁদী আসিয়া, সুলতানকে সংবাদ দিল—"লতিফার চেতনা হইয়াছে!"

সুলতান, তখনই পার্শ্বস্থ কক্ষে চলিয়া গেলেন। আমি সেই কক্ষ মধ্যে জ্ঞান ও অজ্ঞানের, বিস্ময় ও আনন্দের, আশা ও নিরাশার, গভীর আবর্ত্ত মধ্যে পড়িয়া, নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তির মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে সুলতান ফিরিয়া আসিয়া সহাস্য মুখে আমায় বলিলেন,"মনসুর! তোমার অনুমানই যথার্থ। তুমি ভ্রান্ত নও। সে লতিফাই বটে! লতিফা বাঁদীরূপে অন্য নামে সম্প্রতি আমার অন্তঃপুরে আসিয়াছে। বোধ হয়, এখনও দুই মাস অতীত হয় নাই।"

তখন আমার চোখের সম্মুখে—যেন অনন্ত সৌন্দর্য্যভরা, একটা নূতন বিশ্ব জাগিয়া উঠিল। কিন্তু তখনও আমার বিশ্বাস হইল না, যে সে আমার জীবনানন্দদায়িনী হারানিধি লতিফা!

সুলতান আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"আলি মনসুর! মনে ভাবিও না, আমি কেবল লতিফার কথায় বিশ্বাস করিয়া চলিয়া আসিয়াছি। সে যে লতিফা, তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন ও আমি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। দেখ দেখি—এ অঙ্গুরীয় কার?"

অঙ্গুরীয় দেখিবামাত্রই, আমি তাহা চিনিতে পারিলাম। এ অঙ্গুরীয় আমারই নামাঙ্কিত। আমিই সেই ঘটনাময় মিলনের প্রথম রাত্রে, লতিফার অঙ্গুলীতে দুইটী অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিয়াছিলাম। আর এই অঙ্গুরীয়ের একটীই পূর্ব্বোক্ত ধীবরের হস্তগত হইয়াছিল।

সুলতান বলিলেন—“মনসুর! এইবার তোমার বিশ্বাস হইয়াছে তো? কিন্তু সমাধির মধ্য হইতে লতিফা কি করিয়া উদ্ধার পাইল, তাহা হয়ত তুমি জানিতে খুবই উৎসুক। সে কথাও, আমি লতিফাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। সে যাহা বলিল, তাহা অতি অদ্ভুত। খোদা যাহাকে রক্ষা করেন, সাধ্য কি ছার মানুষের—যে তাহাকে নষ্ট করে।”

তোমার প্রাণাধিকা লতিফা বলিল—“সমশেরজঙ্গের ভৃত্যেরা যখন প্রহার জর্জ্জরিত করিয়া আমাকে সেই উপত্যকার মধ্যে সমাধিগর্ভে প্রোথিত করে, তখন আমার সংজ্ঞা ছিল না। তাহারা তাহাদের কাজ শেষ করিয়া চলিয়া যাইবার কতক্ষণ পরে আমার চেতনা হয়, তাহাও আমি ঠিক জানি না। মধ্য রাত্রে খুব ঝড়বৃষ্টি হয়। প্রবল জলধারায় কবরের মৃত্তিকা অনেকটা শিথিল ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। চেতনা হইবার পর আমি বুঝিলাম, পাপিষ্ঠেরা আমাকে জীবন্তে মাটীর মধ্যে প্রোথিত করিয়া গিয়াছে। প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া, আমি সেই কবরের শিথিল মৃত্তিকাস্তূপ সরাইয়া ফেলিলাম। এই প্রবলবৃষ্টিধারাকে খোদা আমার নব-জীবন প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ কারণরূপে, দুনিয়ায় পাঠাইয়াছিলেন। আমি কবর হইতে উঠিয়া, সেই রাত্রেই পাহাড় হইতে এক প্রান্তরে চলিয়া আসি। শরীরের সেই অতি দুর্ব্বল ও কষ্টকর অবস্থাতেও কয়েকটা মাঠ ও মরু-ভূমির একাংশ পার হইয়া, এক ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে এক গৃহস্থের বাটীর দ্বারে আশ্রয় লই। দৌর্ব্বল্য ও পথশ্রান্তির জন্য, আমি সেই গৃহস্থের দ্বারপ্রান্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি। এই মূর্চ্ছাবসানের সঙ্গে আমি দেখিলাম, যাহাদের

বাড়ীর দরোজায় আমি আশ্রয় লইয়াছিলাম, তাহারাই শুশ্রূষা করিয়া আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছে। যে ব্যক্তি আমায় আশ্রয় দিয়াছিল, সে অতি দয়াবান্। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, লোকটা দাস-ব্যবসায়ী। সেই আমাকে বসোরায় আনিয়া দশ সহস্র মুদ্রায়, জাঁহাপনার নিকট বিক্রয় করিয়া গিয়াছে।"

এই কথাগুলি বলিবার পর, সুলতান সহাস্যমুখে বলিলেন—"কেমন দোস্ত! এইবার তোমার বিশ্বাস হইয়াছে ত? লতিফার সহিত তোমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হইলে সে প্রকৃত লতিফা কিনা, তাহা বুঝিতে তোমার বেশী কষ্ট হইবে না।"

বলা বাহুল্য, সেইদিন রাত্রেই সুলতান তাঁহার "দৌলত-আরাম" বলিয়া এক ক্ষুদ্র প্রাসাদে আমার ও লতিফার বিশ্রামস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

পরদিনের মঙ্গলময় প্রভাত, আমার পক্ষে অতি সুপ্রভাত! সেদিনের বালার্ককিরণরেখা যেন অতি সমুজ্জ্বল। প্রভাতের বিহঙ্গম কাকলী, যেন পঞ্চমের সুরমাখা। স্নিগ্ধ প্রভাত-মলয়, যেন অতি সুগন্ধি পুষ্পবাস পূর্ণ। শ্যাম বিটপীর পত্রান্তরালে বসিয়া, পাখীগুলি যে মিলনসঙ্গীত গান করিতে-ছিল, তাহা অতি প্রাণস্পর্শী, মধুবর্ষী ও প্রেমমাখা।

দেখিলাম—সেই প্রত্যুষেই সুলতান দুইজন সুন্দরী বাঁদীর মারফৎ নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার ও দুই প্রস্থ সুন্দর পোষাক লতিফার ও আমার ব্যবহারের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহার সঙ্গে একখানি পত্রও ছিল। সে পত্রে লিখিত ছিল—"মনসুর! বোধ হয়, গত রাত্রে তুমি নিঃসন্দেহ-

রূপে তোমার লতিফাকে চিনিতে পারিয়াছ। এই পোষাকগুলি, আমার সুলতানা তোমাদের মিলনের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ উপহার দিয়াছেন। আমি যেন দৌলত-আরামে গিয়া, তোমাদের এই পোষাকেই সুসজ্জিত মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই।”

আমার চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু দেখা দিল। ভাবিলাম—এই নওশের কুঙ্গ ত সমশেরজঙ্গেরই সহোদর। তাহা হইলে ইঁহাদের একজন দেবতা, আর একজন অমন শয়তান কেন?

লতিফাকে আবেগভরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম—“সুলতানা তোমায় যে পোষাক দিয়াছেন, তাহা পরিয়া প্রস্তুত হইয়া থাক। আমিও আমার কাজ শেষ করিয়া ফেলি।”

আমরা উভয়েই বেশ পরিবর্ত্তন করিলাম। নূতন পোষাকে, নূতন অলঙ্কারে, আমার লতিফাকে যেন রাজরাজেশ্বরীর মত দেখাইতে ছিল।

এমন সময়ে সুলতান সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন—“কেমন দোস্ত! এইবার তোমার ভুল ভাঙ্গিয়াছে ত?”

আমি এ কথার কোন উত্তর দিতে সাহস না করিয়া, নতজানু হইয়া, সুলতানের বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিলাম। আমার দেখাদেখি, লতিফাও সেইরূপ করিল।

সুলতান বলিলেন—“মনসুর! আজ হইতে আমি তোমাকে আমার প্রধান শরীররক্ষীরূপে নিযুক্ত করিলাম। যে বাড়ী তুমি বিক্রয় করিয়া গিয়াছ, কাল রাত্রেই তোমার সেই বাড়ীর অধিকারীকে ডাকাইয়া প্রচুর

মূল্য দিয়া, তাহা আমি তোমার জন্য কিনিয়াছি। আর সেই বাড়ীর সঙ্গে এই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা লতিফাকে আমি তোমায় দান করিলাম। লতিফার সম্বন্ধে তোমার সকল ভুল তো এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! এখন তোমার সম্বন্ধে আমার যে ভুল ছিল—তাহাও আমি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলাম। আশা করি, তুমি আমার এ দুইটী দান উপেক্ষা করিবে না। বোধ হয়, আমার সহোদরও আজ হইতে তোমার কঠোর অভিশাপমুক্ত হইলেন।"

সুলতান নওশেরজঙ্গের এ উদারতায়, আমার চক্ষে কৃতজ্ঞতার অশ্রু বহিল। ইহার উত্তর আর কি দিব, পুনরায় আমি সলজ্জভাবে, কৃতজ্ঞতা-প্লাবিত হৃদয়ে, তাঁহার বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিলাম। লতিফাও সেইরূপ করিল। কিয়ৎক্ষণ অবস্থানের পর, আমাদের হৃদয়ের অনাবিল কৃতজ্ঞতা লইয়া, সুলতান প্রাসাদে চলিয়া গেলেন।

তৎপরদিন আমরা সুলতানের অনুগ্রহে ক্রীত, আমাদের সেই পুরাতন বাড়ীতে আসিলাম। দেখিলাম, বসোরাধিপের সুব্যবস্থায় সেই শূন্য বাড়ী খানি, এক দিনের মধ্যেই যেন এক ক্ষুদ্র রাজপ্রাসাদে পরিণত হইয়াছে। দাসী, বাঁদি, সাজসজ্জা কোন কিছুরই ত্রুটি নাই।

এত দুঃখের পর, আবার সুখের দিন আসিল। জীবনের অতীত ঘটনা গুলি, যেন স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। এইভাবে কিছুদিন গেল।

একদিন চন্দ্রকরোজ্জ্বলিত রাত্রে, আমি ও লতিফা, আমার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার ছাদের উপর বসিয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতেছি। সুবাস মলয় লতিফার চূর্ণ অলক গুলি লইয়া খেলা করিতেছে। সমুজ্জ্বল সুস্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণ

তাহার প্রেমসমুজ্জ্বল মুখের উপর পড়িয়াছে। ষোলকলা পরিপূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদের মত, সে মুখের সৌন্দর্য্য যেন শতগুণে উজ্জ্বল হইয়াছে। এত সুন্দরী আমার লতিফা! মরণের রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া, লতিফা যেন আরও রূপশালিনী—আরও জ্যোতির্ম্ময়ী।

আমি আবেগভরে লতিফার মুখচুম্বন করিয়া বলিলাম—"কে জানিত প্রাণাধিকে! আমাদের আবার এ ভাবে মিলন হইবে? আবার এ সুখের দিন আসিবে?"

লতিফা সহাস্যমুখে বলিল—"শুনিয়াছি, স্বপ্ন খুব কমই সফল হয়। আমি দ্বিতীয়বার মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচিবার পর, প্রায়ই স্বপ্নে দেখিতাম, আবার যেন আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হইয়াছি। দেখিতেছি, আমার সেই স্বপ্ন—সফল হইয়াছে।"

আমি লতিফার সেই চন্দ্রকরপ্লাবিত, রক্তিম গণ্ডদেশ চুম্বনাঙ্কিত করিয়া বলিলাম—"খোদার কৃপায় না হয় কি লতিফা? খোদার কাছে প্রার্থনা কর, আমাদের এ **সফল স্বপ্ন** যেন চিরদিন এইভাবেই থাকে। এ মিলনে যেন আর কখনও বিচ্ছেদ না ঘটে।"

সমাপ্ত